স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

প্রথম প্রকাশ
১৮ই অক্টোবর, ১৯৭৭

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯
১-এ ও ৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীমতী মঞ্জুলা রায়
পূর্বাশা প্রিন্টার্স
১২৪।১এ মানিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

নিবেদন

এই :গ্রন্থের যাবতীয় তথ্য বেদের মন্ত্র বা সংহিতাভাগ থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে, কারণ এই মন্ত্রগুলি থেকেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। ব্রাহ্মণ বা সূত্রগ্রন্থগুলিতে বহুবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা যুক্ত হয়েছে, যা পরবর্তীকালের এবং বিশ্বস্ত উপাদান হিসাবে গণ্য নাও হতে পারে। তথাপি, এই সব শাস্ত্রেও এমন কোনও কোনও কাহিনী পাওয়া যায় যেগুলি সুপ্রাচীন ইতিবৃত্তের সূত্রকে সূচিত করে। এই ধরনের কোনও কোনও বিষয় এই নিবন্ধেও উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে এই রচনার মূল নির্ভর কেবলমাত্র বেদের সংহিতাভাগ। এই গ্রন্থোক্ত সমস্ত মতামতই একান্তভাবে গ্রন্থকারের নিজস্ব এবং বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে রচিত কোন পাশ্চাত্ত্য বা এতদ্দেশীয় গ্রন্থের সহায়তা এই রচনার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় নি।

২।৭-এ, বনমালী সরকার স্ট্রীট

কলকাতা-৫

ইং ১৪.৫.১৯৭৭

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

দেবতাদের পরিচিতি

বৈদিকযুগের মানবদের পণ্ডিতগণ চিহ্নিত করেছেন 'আর্য' আখ্যায়। 'আরিয়ান' (Aryan) শব্দটি প্রচলিত হয়েছে আমাদের অভিধানে প্রাচীনতম একটি মানবগোষ্ঠীকে বোঝাবার জন্য, যাঁরা না কি ইউরাল অঞ্চল থেকে বহু শত বৎসর ধরে ক্রমাগত পূর্বাভিমুখে যাত্রা করে ভারতেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এর সপক্ষে যেমন কিছু তথ্য থাকতে পারে বিপক্ষেও তেমনি যুক্তির অভাব নেই। তথাকথিত আর্যগণ অনায়াসেই ভারত ভূখণ্ড থেকেও পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে যেতে পারতেন এবং সেই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করবার মত কোন বলিষ্ঠ যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা অনুমান করলে ভুল হবে না যে দেবগোষ্ঠীর বহির্ভূত জাতিগুলিকে দেবজাতীয়েরা ক্রমেই বহিষ্কার করে গেছেন এবং যাতে তাঁরা ভারতভূখণ্ডে অবস্থান করতে না পারেন, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। এই বহিষ্কার বহু শতাব্দী ধরেই চলেছিল। এই কার্যক্রমে দেবজাতীয়দের অনেকেও ওই একই রাস্তায় ভারতের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করতে করতে অগ্রসর হয়েছেন। অবশেষে মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে এসে সকলেই কেন্দ্রীভূত হলেন; কারণ এখানে এমন প্রচুর স্থান ছিল যেখানে সকলের পক্ষেই বসবাস করা সম্ভব হত। এই উপনিবেশ স্থাপনকারীরাই অসুর (Assyrian), হত্তীয় (Hittite), হরি (Hurrian), মিতান্নি (Mitannian) প্রভৃতি সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন। এই প্রস্তাব কি নিরতিশয় অযৌক্তিক মনে হয়?

যে গোষ্ঠীকে পণ্ডিতগণ আর্য বলেছেন, বেদ তাকেই আখ্যা দিয়েছেন—দেব বা দেবতা। প্রচলিত ভাষায় এই জাতীয় লোকদের বলা হত 'দাইবা' (গ্রামগেয় সাম)। এই প্রসঙ্গে আর্য শব্দটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলে মন্দ হয় না। বেদে দুটি শব্দ পাওয়া যায়—একটি অর্য, অপরটি আর্য। সংস্কৃত ব্যাকরণের দুর্বোধ্য অভিপ্রায় অনুসারে এই দুটি শব্দ কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্য শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে ঋ-ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় সহযোগে। ঋ-ধাতুর অর্থ গমন করা। এর প্রকৃত অর্থ হওয়া উচিত ছিল—'যা গমনের যোগ্য' এইরকম।

কিন্তু ব্যাকরণ বলছে, স্বামী এবং বৈশ্য অর্থে ঋ-ধাতুর উত্তর যৎ হয়ে 'আর্য' হয়; অন্যত্র ঋ-ধাতুর উত্তর ণ্যৎ-প্রত্যয়যোগেও 'আর্য' হয়। এখানেও সাধারণভাবে অভিধানকারদের মতে রাজা, রাজকুলোদ্ভব, মহাকুল, কুলীন, সভ্য, সজ্জন ও সাধু ব্যক্তিকেই আর্য বলা উচিত। সরল এবং ধাতুগত অর্থে আর্য বা অর্য শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে যিনি গমন করতে সক্ষম তিনি, কেন না 'ঋ' ধাতুর মানে হচ্ছে গমন করা। কিন্তু এই গমন করা বলতে যাযাবরবৃত্তি বোঝাচ্ছে না। এখানে চলা মানে উন্নতি। যিনি উন্নতি করে চলেছেন এবং বুদ্ধিমান তিনিই আর্য। যার মধ্যে উন্নতির কোনও চেষ্টা নেই, একইভাবে প্রায় পশুর ন্যায় বাস করে, সেই অনার্য। দেবতারা সর্বদা উন্নতিশীল ছিলেন বলে তাঁরা নিজেদের আর্য বলতেন। সুতরাং আর্য বা অর্য শব্দে নরগোষ্ঠী বোঝায় না, বোঝায় তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য। আসলে দেবতারা হচ্ছেন একটি নরগোষ্ঠী, যাঁরা বৈদিক সংহিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

এইরকম আরও দু একটি শব্দ আছে যেগুলির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। পৃথিবীর মানুষকেই নাকি বেদমন্ত্রে 'মর্য' বলা হয়েছে কারণ তারা মরণশীল। মৃ-ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় যোগে এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। মৃ-ধাতুর অর্থ মৃত্যু হওয়া। এই অর্থকে মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে দেবতাগণ অমর অর্থাৎ তাঁরা মৃত্যুর অধীন নন। কিন্তু তা অসম্ভব। দেবতারাও তো মানুষেরই একটা গোষ্ঠী। হতে পারে তাঁরা অধস্তন-ভূভাগের লোকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও একই নিয়মে জরা মরণশীল ছিলেন। ঋগ্বেদে দেখা যায়, দেবগণ বহুবার প্রার্থনা করেছেন তাঁরা যেন শত বৎসর বেঁচে থাকেন, তাঁরা যেন শতবর্ষব্যাপী জীবনে প্রতিটি শরৎকালকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বলা হয়েছে— 'দেবতাদের মধ্যে কাকে মৃত্যু আবৃত করে নি? প্রজাগণই বা কেন অমৃতের আবরণে সুরক্ষিত হন নি?' অর্থাৎ প্রাণী মাত্রেই মৃত্যুর অধীন। এক্ষেত্রেও মর্য অর্থে ক্ষয়িষ্ণু বোঝাচ্ছে। দ্যুলোক থেকে যতই ভূমিতল নিম্নাভিমুখে প্রসারিত হচ্ছে ততই তার ক্ষয় অধিকতর হচ্ছে। এই ক্ষয় অর্থে মরণ নয়। এই ক্ষয়ের অর্থ ঐশ্বর্যের স্বল্পতা। মর্ত্য শব্দেও একই অর্থ জ্ঞাপন করে। যে অঞ্চলে উন্নতি স্বল্প পরিমাণে অবরুদ্ধ সে অঞ্চলই মর্ত্য। কিন্তু এ অনুমানও বোধ হয় যথার্থ নয়,

কেন না এই নিবন্ধের শেষভাগে আলোচিত ভূমিসূক্ত থেকে প্রমাণিত হয় মর্ত্যভূমি অমর্ত্যভূমি অপেক্ষা নেহাৎ কম ঐশ্বর্যশালী ছিল না।

মর্ত্য ও অমর্ত্য—এই দুই শব্দের প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে দেবতাদের অমর্ত্যধাম কোথায় ছিল? কোথায় তাঁদের আদিম বাসস্থান? আমরা দেবগণের পরম-নিবাস স্বর্গলোকের উল্লেখ আবহমানকাল থেকেই শুনে আসছি। এই লোকটি একটি কল্পনার জগৎ নয়, একটি যথার্থ ভৌগোলিক ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডটি হিমালয় পর্বতের উচ্চতর বিস্তীর্ণ ভূভাগকে অধিকার করে ছিল এবং এই অঞ্চলটিই হচ্ছে তথাকথিত স্বর্গভূমি। এই স্বর্গভূমিকে এমনভাবে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল যে নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীরা কোনক্রমেই সহজে এই প্রদেশে আসতে সমর্থ হতেন না। এটি উচ্চতর অঞ্চল হলেও এত বেশি উচ্চে অবস্থিত ছিল না যেখানে শৈত্যপ্রবাহে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ত। হিমালয়ের মনোরম দৃশ্যে পরিবৃত সুখ-সেব্য নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলেই দেবতাগণ তাঁদের আদিম বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এটি ঋগ্বেদের ইন্দ্রের সময় সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরব অর্জন করেছিল।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ৬২ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র অনুসারে জানা যাচ্ছে যে ইন্দ্র দিব্যলোকে অধিকার স্থাপন করেছিলেন। এই দিব্যভূমি উচ্চতর লোকে অবস্থিত। এটিকে ভাল করেই জ্ঞাত করেছে আর একটি মন্ত্র—'সহ শ্রুত ইন্দ্রোনাম দেব ঊর্ধ্বো ভুবন্মনুষে দস্মতমঃ (ঋ ২। ২০। ৬);—সেই বিশ্রুত ইন্দ্র নামক দেবতা ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন এবং তিনি মনুষ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর।' এ সম্বন্ধে অধিক তথ্য প্রদান করেছেন অথর্ববেদসংহিতা। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ কাণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্র অনুসারে দিব্য পঞ্চপ্রদেশের ঊর্ধ্বদেশ একটি বিশেষ দিক বলে গণ্য এবং দেবগণকে রাষ্ট্রের ঐশ্বর্যময় উচ্চস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বাদশ কাণ্ডের তৃতীয় সূক্তে একটি মন্ত্রের ভাবার্থ এইরূপ, —অতুলনীয় স্বর্গ অতিশয় প্রশস্ত। এইখানেই মহান সূর্যের আশ্রয়স্থল। দেবগণ দেবতাগণের জন্যই এখানে সবকিছু প্রদান করেন (অথর্ব ১২। ৩। ৩৮)। "—এনং দেবাঃ দেবতাভ্যঃ প্রযচ্ছান্।" এই উক্তি থেকে মনে হয় দেব এবং দেবতা—এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য ছিল। দেব বলতে বোধ করি সামগ্রিকভাবেই একটি জাতিকে বোঝাতো যাঁরা দেবজাতীয়দের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অনুমানমাত্র। আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—"স্বর্গে বহুপ্রকার বর্ণের শরীর দেখা যায়; কিন্তু

এক বর্ণের মানুষ অপর বর্ণের লোককে নিজের মতই দেখে। সৎলোকেরা কৃষ্ণবর্ণকে অপ্রীতিকর বলে পরিত্যাগ করেন। 'যা লোহিত তাকেই তোমার অগ্নিতে সমর্পণ করব' (১২।৩।৫৪)। এই উক্তি থেকে এটি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে দেবগণ বা দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অপরাপর জাতিসমূহ লোহিতাভ শুভ্রকান্তিবিশিষ্ট ছিলেন এবং অনুরূপ বস্তু কামনা করতেন। কৃষ্ণবর্ণের জাতিকে তাঁরা পছন্দ করতেন না। দেবজাতীয়দের মধ্যে এই লোহিতকান্তির ইতরবিশেষ ছিল; কিন্তু তাতে তাঁদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হয় নি। কেবলমাত্র কৃষ্ণকায় জাতিদের তাঁরা একান্তভাবে অপছন্দ করতেন। কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে কারা ছিলেন তাঁদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়; তবে অসুরেরা বোধ করি কৃষ্ণকায় ছিলেন, তথাপি বহু দোষ সত্ত্বেও সভ্যতায় তাঁরা যথেষ্ট অগ্রসর ছিলেন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩১ সূক্তের একুশ সংখ্যক মন্ত্রের উক্তি অনুসারে অসুরেরা যে কৃষ্ণকায় ছিলেন এটাই অনুমান হয়। স্বর্গলোকের বর্ণনায় অথর্ববেদে আরও বলা হয়েছে যে সমগ্র জাতিকে নিয়ে প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁরা বর্ধিত হতে থাকুন, তাঁরা এই পৃথিবীকে মহা বীর্যবতী করে তুলুন। সোজা ঊর্ধ্বপথে সেই লোকে আরোহণ করতে হবে, যাকে লোকে স্বর্গ নামে অভিহিত করে থাকে—'স্বর্গো লোক ইতি যং বদন্তি।' (অথর্ব ১১।১।৭)।

স্বর্গভূমি কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে অথর্ববেদ বলছেন—"সহস্রশৃঙ্গযুক্ত দৃঢ় স্বর্গরাজ্যে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের ভূমি ঘৃতের দ্বারা পূত। এই প্রদেশের পৃষ্ঠদেশে সোম উৎপন্ন হয় এবং এখানকার অধিবাসীরা বীর" (অথর্ব ১৩।১।১২)। এই স্বর্গভূমির সর্বাপেক্ষা নিম্নতম প্রদেশ হচ্ছে দ্যুলোক। সবচেয়ে উঁচুতে না কি থাকতেন পিতৃগণ (অথর্ব ১৮।২।৪৮)। এই নিম্নতম প্রদেশটি অবশ্য নেহাৎ কম উঁচু ছিল না এবং মর্ত্যভূমি থেকে এখানে প্রবেশ করবার পক্ষে স্থানটি বেশ দুর্গম ছিল এটি বলাই বাহুল্য। এই সমস্ত স্বর্গাঞ্চলটিই বহু প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত পথে সংযুক্ত ছিল। এই পথগুলিই দেবযান ও পিতৃযান নামে পরিচিত ছিল।

আর্যভারতের যে যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ আমরা পাই না, পুরাণাদির উল্লেখকেই অবলম্বন করি. সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতের উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি বৃহৎ পর্বতশ্রেণী ছিল; এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই দেবসভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল। সাধারণভাবে বদরিকাশ্রম পেরিয়ে যে

বৃহৎ পার্বত্য ভূভাগ অবস্থিত তাকে বলা হত হৈমবতবর্ষ। এইটি ছিল দ্যুলোকস্থিত দেবভূমি। কনখল, বদরি পেরিয়ে যে পর্বতশ্রেণী ছিল তার নাম পুরাণে নিষধপর্বত। এর পশ্চিমাংশে ছিল হেমকূট পর্বতশ্রেণী। নিষধের উত্তর দিকে ক্রমন্বয়ে গন্ধমাদন (মন্দর), সুমেরু এবং সর্বশেষ নীলপর্বত অবস্থিত ছিল। আবার হেমকূট পর্বতশ্রেণীর পরেই ছিল কৈলাস (হেমকূট কৈলাস),—তারপর মৈনাক। এর পরবর্তী অঞ্চলে অতি সমৃদ্ধ দুটি দেশ ছিল—একটি কেতুমাল অপরটি উত্তরকুরু। এই সমস্ত অঞ্চলটিকে বলা হত হরিবর্ষ। হরষ্ শব্দে তেজ বোঝায়। এই অর্থে হরি শব্দের প্রয়োগ হত এবং তেজস্বী অশ্বকেও হরি বলা হত। মধ্যপ্রাচ্যের সুপ্রাচীন 'হরিয়ান' (Hurrian) জাতি এই হরিবর্ষের কোনও অভিযানকারী সম্প্রদায় হওয়া অযৌক্তিক নয়।

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেতপর্বত এবং কালশৈল -এই পার্বত্য অঞ্চলে গঙ্গা সপ্তধা হয়ে গিয়েছিল। কালশৈল (কৃষ্ণবর্ণ পর্বত) অতিক্রম করে ছিল শ্বেতপর্বত এবং মন্দরগিরি, যার অপর নাম ছিল গন্ধমাদন। এই সব অঞ্চলে যক্ষ এবং গন্ধর্বগণ বাস করতেন। হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, নীলপর্বত (যা ছিল বৈদূর্যমণিময়) ও শ্বেতপর্বত—এই বিশাল পার্বত্যভূমি যেন সব মিলিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নীলপর্বত ছিল সবচেয়ে দূরতম সীমা এবং নিষধগিরি ছিল নিকটবর্তী অঞ্চল। এই নীল এবং নিষধের মধ্যে ছিল সুমেরু পর্বত যাকে ঘিরে দেবসভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। এই সুমেরু পর্বতের পাশে ছিল ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু এবং উত্তর কুরু—এই চারিটি দেশ। সুমেরু অঞ্চলে সুবর্ণের প্রাচুর্য ছিল এবং এই অঞ্চলে দেবজনদের গতিবিধি ছিল খুব বেশী।

যে সব জনপদের উল্লেখ করা হল সে সব স্থানের অধিবাসীরা ছিলেন অতিশয় কান্তিমান। মহাভারত জানাচ্ছেন কেতুমালের পুরুষ ও রমণীদের গাত্রবর্ণ ছিল সুবর্ণসদৃশ। তাঁদের স্বাস্থ্য ছিল দৃঢ় এবং অটুট। তাঁরা দীর্ঘজীবী ছিলেন। উত্তরকুরুর অধিবাসীরাও ছিলেন অপূর্ব সুন্দর। ভদ্রাশ্ব নামক দেশের লোকেরা ছিলেন শ্বেতবর্ণ, প্রিয়দর্শন এবং নৃত্যগীতপ্রিয়। এক কথায় এই সমগ্র অঞ্চলে এমন কতকগুলি জাতি ছিলেন যাঁরা ছিলেন অতি প্রিয়দর্শন, সুসভ্য এবং অতিশয় শক্তিসম্পন্ন; কিন্তু অসুরগণের বাসভূমির কথা জানা যায় না। বেদসংহিতা বলছেন, এদের বাসভূমির নাম অসূর্যলোক। এদের বোধ করি জোর করেই

নিকৃষ্টতর স্থানে বাস করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই হচ্ছে দেবভূমির একটি মোটামুটি পরিচয়।

দেবজাতীয়ের নায়কস্বরূপ ছিলেন দশজন। অথর্ববেদ একাদশ কাণ্ড সেরকমই বলেছেন (অ ১১।৮।১০)। আবার ঋগ্বেদ তৃতীয় মণ্ডলে এই সংখ্যাকে আরও অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (ঋ ৩।৯।৯)। সম্ভবতঃ তাঁদের স্থলে তাঁদের পুত্রেরা অভিষিক্ত হতেন। এটা যে নিশ্চিত রীতি ছিল তা অবশ্য নয়। অগ্নি বা বরুণকে যে দেবতা বলা হয়েছে তার অর্থ এঁরা যে সব কার্যে অগ্নি বা জলের প্রয়োজন হত তার তত্ত্বাবধান করতেন। অজ্ঞতাবশতঃ ক্রমে ক্রমে অগ্নিকেই পূজা করা হয়েছে। অবশ্য শ্রদ্ধাবশতঃ অগ্নি বা জলকে দেবগণও মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করতেন, কিন্তু তা হচ্ছে প্রকৃতির পূজা,—আসলে যাঁরা দেবতা ছিলেন তাঁরা ছিলেন এই সব বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারক কর্মচারী, যাঁরা ইন্দ্রের অধীনে কাজ করতেন। দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত বলে মনে করা হত তাঁদের একত্রে নাম দেওয়া হয়েছিল বিশ্বদেব। ঋগ্বেদ অনুসারে এরা ছিলেন— ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অস্রিধ, অর্যমণ, বরুণ, সোম, অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতী (ঋ ১।৮৯।৩০)। মতান্তরে এদের নাম ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্যমা, সবিতা, মিত্র, অদিতি, পৃথিবী এবং দ্যৌ (ঋ ১।১০৭)। বলা বাহুল্য সিন্ধু, পৃথিবী, দ্যৌ প্রভৃতি কেবল শ্রদ্ধাজ্ঞাপক অর্থে উল্লিখিত হয়েছে; আসল দেবতারা ছিলেন— ইন্দ্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, অগ্নি এবং সরস্বতী, যাঁরা বৃহৎ বৃহৎ ভূমিকায় নিযুক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদের ইন্দ্র যখন স্বর্গশাসন করতেন তার বহু আগে থেকেই আসমুদ্র নিম্নভারতের ভূখণ্ড দেবগণের কাছে সুপরিচিত হয়ে গেছে, এমনকি তাঁরা কখনও কখনও মর্ত্যেও বসতি স্থাপন করেছেন। অথর্ববেদ বলছেন, ত্বষ্টার পিতা উত্তর ত্বষ্টার সময় থেকে পার্বত্যপথ ছিদ্র করে এবং গুহা ইত্যাদি পরিষ্কার করে মর্ত্যে দেবপুরুষগণ গৃহস্থাপন করেছিলেন (অ ১১।৮।১৮)। গৃহনির্মাণের কৌশলও দেবজাতীয় ব্যক্তিরাই আগে প্রদর্শন করেন—'দেবেভির্নির্মিতাস্যগ্রে। তৃণং বসানা সুমনা অসস্তমধাস্মভ্যং সহবীরং রয়িং দাঃ (অ ৩।১২।৫ শালা নির্মাণম্)।' অথর্ববেদ বলছেন—দেবতাগণ যে পুরী নির্মাণ করতেন তার উপরিভাগ হত হরিদ্বর্ণের, মধ্যভাগ হত শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট এবং ভূমিতল হত লৌহময়। এতে অনুমান হয় যে গৃহের উপরের দিকে কিছু না কিছু সুবর্ণের আস্তরণ থাকত। দেয়ালগুলি

আজকালকার চুনকাম করা দেয়ালের মতই শুভ্রবর্ণের হত, অথবা তাতে শুভ্র রজতের কারুকর্ম থাকত এবং মেঝে অত্যন্ত দৃঢ় হত। প্রয়োজনবোধে যথাস্থানে লৌহসন্নিবেশও করা হত। একথাও বলা হয়েছে যে দেবগণই প্রথম হিরণ্ময় পুরী নির্মাণ করেছিলেন (অ ৫।২৮।৯, ১০, ১১)। এ অবশ্যই অত্যন্ত বিত্তশালী দেবতার গৃহ। সাধারণ স্বর্গবাসীর গৃহ তৃণাচ্ছাদিতই হত, অথবা বাঁশ বা কাঠের বাড়ির প্রচলনও ছিল। হরিদ্বর্ণের খড় দিয়ে চাল ছাওয়া হত; ঘরের বেড়া শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত করা হত এবং মাটির মেঝে যাতে কোনও প্রাণীদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে সেইজন্য তাকে সুদৃঢ় করা হত। যাঁরা সমর্থ ছিলেন তাঁরা প্রস্তরগৃহ নির্মাণ করতেন। তবে দেবগৃহের এইটিই ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে গৃহশীর্ষ হবে হরিদ্বর্ণ, গৃহপ্রাচীর হবে শুভ্রবর্ণ এবং গৃহভিত্তিতে মৃত্তিকার সঙ্গে লৌহও প্রোথিত থাকবে। বৈদিক সংহিতার বিবিধ বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় দিব্যলোকে সুবর্ণের অভাব ছিল না;—সরল জীবনযাপনের তুলনায় তাঁদের ঐশ্বর্য ছিল বিপুল। বিখ্যাত ভূমিসূক্তে বলা হয়েছে—"যাঁর অভ্যন্তরে দেবতাদের নির্মিত গৃহ বর্তমান, যাঁর ক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে কৃষিকর্ম করা হয়, প্রজাপতি সেই বিশ্বগর্ভা পৃথিবীকে দিকে দিকে রমণীয় করে তুলুন।" এটি দেবগণের মর্ত্যভূমিতে বসতি স্থাপনের প্রমাণ।

সংহিতাভাগে যে ইন্দ্রের জীবনালেখ্য পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে তখন মর্ত্যভূমির বিস্তৃতি এবং সমুদ্রযাত্রা পর্যন্ত সবই দেবজাতীয়দের জানা ছিল। ঋগ্বেদে মনুষ্য-অধ্যুষিত পঞ্চক্ষিতির উল্লেখ আছে (ঋ ১।৭।৯)। এই পাঁচটি মর্ত্যদেশ সম্বন্ধে নানারকম অনুমান করা হয়েছে। অথর্ববেদ বলছেন দিতি এবং অদিতির পুত্রগণ গভীর সমুদ্রাঞ্চলেও ধাম বা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন (অ ৭।৭)। এই 'ধাম' অর্থে কি বোঝানো হয়েছে সেটা সম্যক্ অনুধাবন করা যাচ্ছে না, তবে অনুমান হয় সেই সুপ্রাচীন যুগেও অর্ণবপোতের পরিকল্পনা হয়েছিল। একদা অশ্বিদ্বয় সমুদ্র থেকেই রাজকুমার ভুজ্যুকে উদ্ধার করেছিলেন। ঋগ্বেদে একাধিকবার সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র এই সপ্তসিন্ধুবেষ্টিত দেশকে হিংসা এবং পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন, একথাও বলা হয়েছে (ঋ ৮।২৪।২৭)। ঋগ্বেদের দশম: মণ্ডলে পঞ্চক্ষিতি ও স্বর্গাঞ্চলে প্রবাহিত কয়েকটি নদীর নাম করা হয়েছে, যথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রী,

পরুষ্ণী, অসিক্নী, মরুদ্‌বৃধা, বিতস্তা, তৃষ্টামা, সুসর্ত্না, রসা, শ্বেতী, সিন্ধু, কুভা, গোমতী, ক্রুমু, মেহৎত্বা, ঋজীতী এবং রুশতী (ঋ ১০।৭৫।৫, ৬, ৭)। এর মধ্যে যথাযথভাবে সাতটি প্রধান নদীর নাম করা শক্ত; তবে—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রী, পরুষ্ণী, বিতস্তা এবং সিন্ধু—এইগুলির উল্লেখ বিশেষভাবে করা যায়। কেউ কেউ বিতস্তা, অসিক্নী, পরুষ্ণী, বিপাশা, শুতুদ্রী—এই পাঁচটি পাঞ্জাব অঞ্চলের নদী এবং সরস্বতী ও সিন্ধুর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যাই হোক, ইন্দ্রের সময় সাতটি প্রধান নদী ছিল দেবতাদের বিশেষ ব্যবহারার্থে; আরও বহু নদী মনুষ্যগণ দেবগণের জন্য নাব্য করে তুলেছিলেন। আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—সরস্বতী, সরযূ এবং সিন্ধু—এই তিনটি ছিল সবচেয়ে বড় নদী (ঋ ১০।৬৪।৯)।

দেবতারা মূলতঃ ছিলেন কৃষিনির্ভর জাতি। কৃষ্টি এবং চর্ষণী—এই দুটি শব্দই সংহিতায় সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত। কৃষ্টি বলতে যে মনুষ্য-সম্প্রদায়কে বোঝাতো তারা ছিল কৃষিনির্ভর এবং 'চাষা' শব্দটি আজও 'চর্ষণী' শব্দের স্থলে প্রচলিত। অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র নিজেও হাল চালনা করতেন (অ ৩।১৭।৪), যদিও সেটি আনুষ্ঠানিকভাবেই হত। দ্যুলোক অর্থাৎ উচ্চভূমিতে বাস করলেও চাষযোগ্য জমি যেখানেই ছিল সেখানেই কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হত এবং তথাকথিত স্বর্গভূমিতে বিবিধপ্রকার শস্যের ফলন পর্যাপ্ত পরিমাণে হত, একথা নিশ্চিতভাবেই জানা যায়। এরই সঙ্গে ছিল উন্নতপ্রথায় গোপালন। বস্তুতঃ গোসম্পদ ছিল দেবতাদের একটি প্রধান সম্পদ। বারবার দস্যুরা গোসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে এবং তাদের উদ্ধার করে আনা হয়েছে, এরকম আখ্যায়িকা কম নেই। দেবতাগণের আদর্শে ক্রমেই মর্ত্যভূমি ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ডে বহু মন্ত্রে পৃথিবীকে যেভাবে বন্দনা করা হয়েছে তার তুলনা প্রাচীন বিশ্বসাহিত্যে আর বোধ করি কোথাও মেলে না। এইটিই প্রখ্যাত ভূমিসূক্ত (অ ১২।১)। এইটিতে সেই সময়কার মর্ত্যভূমির বর্ণনা করা হয়েছে যখন দেবতাদের আদর্শে পৃথিবীর রাষ্ট্র, সমাজ, কৃষি, ধর্ম প্রভৃতি তাবৎ আদর্শ রূপায়িত হয়ে উঠেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় পৃথিবীকে অর্থাৎ পঞ্চক্ষিতিকে একটি দ্বিতীয় স্বর্গরূপে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটা অবশ্য ঋগ্বেদীয়

ইন্দ্রের অনেক পূর্বকালের কথা,—কারণ উক্ত ইন্দ্রের বহু পূর্ব থেকেই পৃথিবী যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছে। ইন্দ্র তার ফলভোগে যত্নবান হয়েছিলেন মাত্র।

দেবজাতীয়দের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমরা সংহিতাভাগ থেকে বেশি কিছু পাই না। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী হওয়াতে এঁদের পরিচ্ছদের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকারই সম্ভাবনা। সমগ্র হিমাচলভূমি থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটি লিপি বা প্রস্তরচিত্র পাওয়া যায় নি যাতে তাঁদের বেশভূষা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তবে দেবগণ সাধারণভাবে অশ্বারোহণে পারদর্শী ছিলেন। এই কারণে তাঁদের পরিধেয় এমনভাবে প্রস্তুত হত যাতে এই কাজে কোনও বাধা ঘটত না। পার্বত্য-পথে গমনাগমনের জন্যও তাঁদের পোষাকে প্রশস্তভাবটা বেশি না থাকাই স্বাভাবিক ছিল। তবে, কেশের পরিপাট্য তাঁদের বেশ কিছুটা ছিল। প্রশস্ত কেশ তাঁরা চূড়া করে বেঁধে রাখতেন। অনেকে উষ্ণীষও পরিধান করতেন। অলঙ্কার এবং আভরণ তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 'রুক্ম' শব্দে রোচমান আভরণ বোঝাতো। চক্ষে অঞ্জন পরতেন তাঁরা খুব যত্ন সহকারে। দেবতারা ত্রিবৃৎ উপবীত ধারণ করতেন (অ। ৫।২৮।১১) এবং মেখলাবন্ধন সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন (অ ৬।১৩৩।১) মেখলা নানারকমই হতে পারত। কখনো কখনো এটি উত্তরীয়ের কাজ করত কখনো বা এটি দৃঢ় কটিবন্ধরূপে ব্যবহৃত হত। দেবজাতীয় ব্রহ্মচারিগণ কৃষ্ণচর্ম পরিধান করতেন এবং দীর্ঘশ্মশ্রু রাখতেন (অ ১১।৫।৬)। ইন্দ্রের শ্মশ্রুর উল্লেখও দেখা যায় কোনও কোনও মন্ত্রে। বৃষচর্মের পাদুকার ব্যবহার তখনও ছিল। অথর্ববেদের ঋষভ (বৃষ) সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে বলা হয়েছে —'দেবানাং ভাগ উপানহ এষঃ', অর্থাৎ এই উপানহ দেবতাদের ভাগে পড়ছে। এর স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এই যে ঋষভচর্মই ছিল দেবতাদের পাদুকার উপাদান। উপনহ্যতে বা উপনহ্যতি ক্রিয়ার অর্থ হচ্ছে বন্ধন। উপনাহ এবং উপানহ (উপানৎ) —এই দুটি শব্দের অর্থ একই অর্থাৎ পদদ্বয়ের আচ্ছাদন। দেবগণ কাষ্ঠপাদুকাও ব্যবহার করতেন। 'দ্রুপদ' শব্দটি কাষ্ঠপাদুকারই প্রতীক।

সেযুগে দেবগণকে যেমন কৃষিকর্মে ব্যাপৃত থাকতে হত তেমনি প্রায় প্রতিনিয়তই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধেও লিপ্ত থাকতে হত। এই কারণে যুদ্ধোপকরণ এবং যুদ্ধযাত্রা তাঁদের জীবনের একটি চিত্তাকর্ষক অধ্যায়।

দেবলোকে ধনুর্বাণ, তরবারি, কুঠার, ভল্ল—প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র তখন প্রচুর

ব্যবহৃত হত। রুদ্রেরা বিশেষ করে পিনাক নামক ধনুর ব্যবহার করতেন (য ৩। ৬১)। শ্বেতপক্ষযুক্ত চতুষ্পদী একপ্রকার শর ব্যবহৃত হত যার নাম ছিল শিতিপদী। চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে তখনকার দিনে নানাপ্রকার বর্মের ব্যবহার। বর্মকে সাধারণতঃ কবচ বলা হত। এ ছাড়া 'মণি' শব্দেও বর্ম বোঝাতো। অথর্ববেদ এ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক তথ্য প্রদান করেছেন। এগুলি প্রায়ই হত ধাতুনির্মিত। এই ধাতব বর্মগুলিকে কাঠের সঙ্গে এঁটে গায়ে, হাতে বা বক্ষে বসিয়ে দেওয়া হত। অভিবর্তমণি ছিল একটি রাজচিহ্ন। ইন্দ্রের একাধারে সেনাপতি, পুরোহিত বা ব্রহ্মণস্পতি ছিলেন বৃহস্পতি। ইনি ইন্দ্রের শরীরে এই কবচ বেঁধে দিতেন। এই মণি ধারণ করলে শত্রু পরাজিত হত। প্রতিসর মণিও ছিল একপ্রকার বর্ম অথবা কবচস্বরূপ। ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, রুদ্র, অগ্নি, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতাগণ এই মণি ব্যবহার করতেন। কশ্যপ না কি এই মণির প্রবর্তন করেন। একে দেবমণি বলা হত (অ। ৮।৫)। লৌহফলাযুক্ত খদিরকাষ্ঠের বর্মকে ফালমণি বলা হয়েছে। এই বর্মও বৃহস্পতি এবং ইন্দ্র ধারণ করতেন (অ ১০।৬।৬)। ইন্দ্রের শত কবচের মধ্যে দর্ভমণি একটি। একে 'দেববর্ম' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই মণি রাষ্ট্রসমূহকে রক্ষা করত (অ ১৯।৩০।৩)। অস্তৃত নামক একটি মণি ধারণ করে ইন্দ্র যাতুধান, দস্যু এবং পণিদের বিনাশ করতেন।

দেবসৈন্যেরা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যুদ্ধযাত্রা করতেন। তাঁরা অরুণবর্ণের কেতু উড্ডীন করে অগ্রসর হতেন। অনেক সময় তাঁদের কেতুতে সূর্যচিহ্ন থাকত (অ ৫।২১।১২)। এতে প্রমাণিত হয় দেবগণ চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, নতুবা সূর্য্যাঙ্কিত কেতু প্রস্তুত করতে পারতেন না। যুদ্ধকালে দুন্দুভি বাজতে থাকত। অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডে দেবসৈন্যদের ত্রিষন্ধি এবং অরুণ-কেতুসহ শত্রুদের আক্রমণ করবার কথা বলা হয়েছে। এই ত্রিষন্ধি বজ্রের তিনটি সন্ধি ছিল ;—একটি অয়োমুখ, আর একটি সূচীমুখ (ছুঁচোলো মুখ) এবং তৃতীয়টি ছিল বিকংকতী মুখ অর্থাৎ কাঁটার মত মুখ। এই বজ্রের প্রহারে শত্রুগণ অতিশয় কাতর হয়ে পলায়ন করত। আঙ্গিরস বৃহস্পতি অসুরক্ষয়ের জন্যই এই বজ্রটি দিব্যলোকে প্রচলিত করেন। ত্রিষন্ধি সর্বপ্রকার কবচ ও বর্ম ভেদ করতে পারত। বৃত্রহা ইন্দ্রকে ত্রিষন্ধি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এতে অনুমান হয়, এই

ত্রিষন্ধি বজ্র বৃত্র হননের জন্য যে বজ্র নির্মিত হয়েছিল তার পরবর্তী কালে নির্মিত হয় (অ ১১।১০।১, ২, ১০)।

ধূমাক্ষী নামক একটি অস্ত্র প্রয়োগের কথা জানা যায় (অ ১১।১০।৭)। এটি সম্ভবতঃ একটি গোলক ছিল যেটি শত্রুদের মধ্যে পতিত হয়ে ফেটে যেত এবং ধূম্রজাল সৃষ্টি করে শত্রুদের দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করত। এর প্রচণ্ড আওয়াজে শত্রুরা ভীত হয়ে পলায়ন করত।

আর একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে 'ইন্দ্রজাল'। এর বর্ণনাও অথর্ববেদেই প্রদান করা হয়েছে (অ ৮।৮)। এই প্রসঙ্গেই দাহিকাশক্তিসম্পন্ন এবং বিষাক্ত গন্ধযুক্ত একরকম পূতিরজ্জুর উল্লেখ করা হয়েছে। এই রজ্জুগুলি ধীরে ধীরে পুড়তে থাকত এবং পূতিগন্ধযুক্ত ধোঁয়ায় শত্রুগণ ক্লিষ্ট ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। তখন পলায়ন ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকত না। শত্রুগণকে একরকম দৃঢ় ও বৃহৎ জালে আবদ্ধ করা হত। এটি ছিল সেকালের একটি Camouflage-এর পদ্ধতি। যে বর্ণনা দেওয়া আছে তাতে মনে হয় বিরাট বিরাট জাল গাছের উপরে শাখায় শাখায় এমনভাবে বিস্তৃত করা হত যে তার অস্তিত্ব ধরা পড়ত না। আবার নীচের ভূমিতেও চতুরভাবে জাল বিস্তৃত করে রাখা হত। এইসব জালের ভিতর আবদ্ধ হলে শত্রুদের বেরোবার আর কোনও উপায় থাকত না। বোধ হয় এই জালগুলি পাতবার কতকগুলি উপযুক্ত স্থানও বেছে নেওয়া হত। এই সব স্থানে অশ্বত্থ, খদির প্রভৃতি গাছ থাকত। জালের সঙ্গে পরুষাহব নামক একপ্রকার শরজাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে প্রস্তুত একরকম বেড়া দিয়েও কতকগুলি জায়গা ঘিরে ফেলা হত। কিরকমভাবে এই জালগুলি গোটানো হত সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সাধ্যগণ জালদণ্ডের একাংশ ওঠাতেন, রুদ্রগণ ওঠাতেন আর এক অংশ ; অপর দুটি অংশ গুটিয়ে নিতেন যথাক্রমে বসু ও আদিত্যগণ। বিশ্বদেবগণ উপরে যারা আবদ্ধ হয়েছে তাদের ধ্বংস করে উপরের জাল গুটিয়ে ফেলতেন। আঙ্গিরসগণ জালের মধ্যভাগে আবদ্ধ শত্রুদের বিনষ্ট করে মধ্যস্থল মুক্ত করতেন। এছাড়া বন্য পশু, সর্প প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরাও বন্দীদের মেরে ফেলত। এই সব জালে মৃত্যুপাশসমূহ লুক্কায়িত থাকত এবং সেগুলি থেকে কারুর মুক্তি ছিল না। ইন্দ্র নিজের পরিকল্পনা অনুসারে এই সমস্ত কার্যক্রম সাফল্যে পরিণত করতেন বলে

একে 'ইন্দ্রজাল' নাম দেওয়া হয়েছিল। এই ঐতিহ্য থেকেই বোধ করি ইন্দ্রজাল শব্দটি ম্যাজিক অর্থে প্রচলিত হয়েছে।

সে যুগে অশ্বচালনা এবং রথের ব্যবহার বেশ ভালরকম জানা থাকায় ক্ষেত্র-বিশেষে অশ্ব এবং যানসহযোগেও যুদ্ধ করা হত। এই যুদ্ধ ব্যাপারটি বেশ নৃশংস ছিল। যুদ্ধে যারা বিনষ্ট হত তাদের দেহ সেইখানেই পড়ে থাকত এবং সেগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে ভূগর্ভে চাপা পড়ে যেত। তাদের অস্থিগুলি প্রোথিত হয়ে থাকত। যেখানে যুদ্ধ হত সেখানে এইভাবে বহু দেহাস্থি পড়ে থাকতে দেখা যেত কিছুকাল পরে।

দেবতাগণ শত্রুদের প্রতি নিরতিশয় কঠিন হলেও প্রতিবেশী অপরাপর জাতিদের সঙ্গে মিত্রতার সঙ্গে বাস করতেন। অসুর, দস্যু প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতিদের বিরুদ্ধে তাঁরা একটি বৃহৎ মিত্রগোষ্ঠী স্থাপন করেছিলেন, যাঁদের বলা হত—'দেবজন'। এঁরা সকলেই দেববর্গীয় ছিলেন না, কিন্তু দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের স্বভাবের ঐক্য ছিল এবং এঁদের অনেকেই দেবধর্ম অনুসরণ করতেন। গন্ধর্বেরা ছিলেন সভ্যতায় কোনো কোনো বিষয়ে দেবতাদের চেয়েও অগ্রসর। তাঁরা অত্যন্ত শান্তিকামী জাতি ছিলেন, দেবতাদের মত যুদ্ধে স্পৃহা তাঁদের মধ্যে দেখা যেত না যদিও তাঁরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না এমন নয়। অশ্বপালনে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং সোমরস প্রস্তুতের পন্থা তাঁরা অনেক আগে থেকেই জানতেন।

গন্ধর্বগণ অতি প্রাচীনকালে কোথায় থাকতেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে গন্ধর্বদের কথা উঠেছে অশ্বদের প্রসঙ্গে। অশ্বগণকে পুরুষদের পুত্রস্বরূপ বলা হয়েছে (ঋ ১। ১৬২। ২২) এবং অশ্ব যে সমুদ্র থেকে জায়মান একথাও জানানো হয়েছে। তখন এদের নাকি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় পক্ষ ছিল। বেদ বলছেন যে অশ্ব প্রথম যম কর্তৃক প্রদত্ত হয়, বসুগণ এদের শিক্ষাপ্রদান করেন, গন্ধর্বগণ এদের লাগাম ধরে গতিশিক্ষা দেন এবং রাজা ত্রিত এদের রথে যোজনা করেন। ইন্দ্রই না কি অশ্বকে প্রথম এঁদের কাছ থেকে অধিকার করেন, অথবা এঁরাই অশ্বকে প্রথম ব্যবহারের জন্য ইন্দ্রকে অর্পণ করেন। কিন্তু, বৃত্রহন্তা ইন্দ্রই প্রথম অশ্বপরিচালক ছিলেন না ; তার বহু পূর্ব থেকেই অশ্বের এবং রথের ব্যবহার চলে এসেছে। অতএব, এই ধরণের উক্তির মধ্যে কিছু আতিশয্য আছে। তবে এটা

ঠিক যে ইন্দ্র অশ্বের ব্যবহারকে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত ও যোগ্যতর করে তুলেছিলেন। যেসব প্রাণিতত্ত্ববিদ্ অশ্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন তাঁরাই বলতে পারবেন আদিতে পক্ষযুক্ত অশ্বের উদ্ভব সম্ভব ছিল কি না,—তবে ঋগ্বেদের আমল থেকেই পক্ষবিশিষ্ট অশ্ব সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী চলে আসছে। পক্ষ বলতে একরকম বর্মও বোঝা যেতে পারে। অশ্বকে নানাপ্রকার প্রদেশে পরিচালনার জন্য তার অঙ্গের রক্ষণের একটা ব্যবস্থা বোধ করি ছিল এবং চলবার সময় তাদের পার্শ্বদেশ যাতে সুরক্ষিত থাকে, এইজন্য একরকম হালকা বর্ম ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল না। যম ছিলেন পিতৃলোকের অধিপতি। পিতৃলোক স্বর্গের উপরিভাগে অবস্থিত ছিল। সমুদ্র থেকে জায়মান অশ্ব কি করে যমের কাছে আনীত হল সে সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেছেন 'অপ্‌সু যোনির্বা অশ্বঃ', অর্থাৎ জল থেকে অভ্যুদয় হয়েছে বলেই একে অশ্ব বলা হয়। এই সব উল্লেখ থেকে অনুমান হয় আদিতে যে অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জলাশয় ছিল সেখানকার অরণ্যপ্রদেশে অশ্ব পাওয়া যেত। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলেও অশ্ব পাওয়া যেত এবং পৃথিবীর বহু পার্বত্য অঞ্চলেই নানাপ্রকার অশ্ব আজও দুর্লভ নয়। তবে গন্ধর্বেরা জল ভালবাসতেন ; সেই কারণে সুপ্রাচীনকালে অর্থাৎ স্বর্গাঞ্চলে বসতি স্থাপনের পূর্বে হয়ত তাঁদের পূর্বপুরুগগণ সমুদ্রাঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। অপ্সরাগণও সমুদ্রাঞ্চলে ছিলেন এমন উল্লেখ পাওয়া যায় (অ ২।৩-৪)। এঁরাই ছিলেন গন্ধর্বদের প্রেয়সী। সাধারণতঃ গন্ধর্বগণ অপ্সরাদেরই বিবাহ করতেন। স্বর্গাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও অপ্সরাগণ সরোবরের তীরে বাস করতেন এবং তাঁদের প্রতিবেশী থাকতেন গন্ধর্বেরা। প্রথমে না কি সপ্তবিংশতি গন্ধর্ব বায়ু বা মনের তুল্য দ্রুতগামী অশ্বকে শাসন করেছিলেন (য ৯।৭)। দিব্যলোকে বসতি স্থাপনের পর গন্ধর্বদের দিব্যগন্ধর্ব বলা হত (য ৩০।১)। তাঁরা বিজ্ঞানবিশারদ ছিলেন বলে তাঁদের 'কেতপূ' (যঃ কেতেন বিজ্ঞানেন পুনাতি) আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আর এক শ্রেণীর গন্ধর্ব, যাঁদের কলিগন্ধর্ব বলা হত, তাঁরা অন্তরীক্ষের অধিবাসী ছিলেন। স্বর্গ এবং মর্ত্যের মাঝামাঝি অঞ্চলকে অন্তরীক্ষলোক (অন্তরিক্ষ) বলা হত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কোনও আখ্যায়িকায় এই সংবাদ পাওয়া যায়। এই স্থানটিকেই হয়ত ঋগ্বেদে ধ্রুবস্থান বলা হয়েছে। গন্ধর্বগণ বিদ্যাচর্চা করতেন এবং তাঁদের অথর্ববেদে 'বিধাম' বলা হয়েছে (অ ২।১।২)। আবার বিভিন্ন

ক্রীড়াতেও এঁদের দক্ষতা ছিল। অথর্ববেদ জানাচ্ছেন এঁরা উত্তম অক্ষবিৎ ছিলেন (অ ৭।১০৯।৫)।

ইন্দ্রের সময় যেমন দেবজাতি সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত হয়েছিলেন গন্ধর্বগণ তেমনি গৌরব অর্জন করেছিলেন রাজা বিশ্বাবসুর সময়। রাজা বিশ্বাবসু অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর কেশ ছিল হিরণ্যাভ। তাঁর দেশকে তিনি প্রচুর ধনরত্নে ঐশ্বর্যসম্পন্ন করে তুলেছিলেন। স্বর্গনায়ক ইন্দ্রের সঙ্গে রাজা বিশ্বাবসুর সখ্যতা ছিল। বিশ্বাবসু সোমের গুণাবলী জানতেন। সোম সম্বন্ধে আর একটি তথ্যে বলা হয়েছে—বশা নামক উৎকৃষ্ট গোজাতিকে কলিগন্ধর্বগণ সমুদ্রের অন্তর্গত কোনও দ্বীপে পালন করতেন এবং তাদের দুগ্ধ বিশেষভাবে সোমের সঙ্গে মিশ্রিত করা হত (অ ১০।১০।১৩)। গন্ধর্বেরা যদিও স্বর্গলোকের নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকতেন তথাপি তাঁদের নিজেদেরও একটি প্রদেশ ছিল এবং সেই দেশ প্রচুর সূর্যকিরণে পরম রমণীয় বোধ হত।

গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ পুণ্যগন্ধবিশিষ্ট ছিলেন। সূর্যবর্চস্ নামক এক গন্ধর্বের দুই পুত্র ছিলেন – চিত্ররথ এবং বসুরুচি। দ্বিতীয় পুত্র বসুরুচি এক প্রকার কমলপুষ্প আহরণ করে তার চাষ করেছিলেন। এই কমলপুষ্প-সমন্বিত স্থানেই গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ অবস্থান করতেন। তাঁদের পুণ্যগন্ধ বলার এটিও একটি কারণ (অ ৮।১০)। হিমালয়ে যে ব্রহ্মকমল পাওয়া যায় তা এই কমল থেকেই প্রচার লাভ করে কি না সে বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয়।

গন্ধর্বগণের পরেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন রুদ্রগণ। হ্রস্বকায় রুদ্রেরা গিরিতে বাস করতেন এবং তাঁরা একটি পার্বত্য জাতি ছিলেন বলেই মনে হয়। এঁদের গ্রীবাদেশ নীল এবং লোহিত বর্ণদ্বারা রঞ্জিত থাকত অথবা তাঁরা গ্রীবা দেশে এই দুটি বর্ণের বস্ত্র স্থাপন করতেন। তাঁদের মাথায় থাকত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, যার জন্য তাঁদের কপর্দী বলা হত। এই দীর্ঘ কেশের বর্ণ ছিল হরিদ্রাভ (য। ষোড়শাধ্যায়)। অথর্ববেদ জানাচ্ছেন রুদ্রদের মাথায় শিখা থাকত এবং সেটি নীলবর্ণের কোনও অলঙ্কারে শোভিত হত। এই কারণ তাঁদের বলা হত শিখণ্ডী (অ ১১।২।৭, অ ১১।২।১২)। আবার কখনো কখনো তাঁরা মুণ্ডিত-কেশও থাকতেন (য ১৬।২৯)। তাঁদের মধ্যে অভিজাতগণ উষ্ণীষ ধারণ করতেন (য ১৬।২২)। এঁরা দেখতে ছিলেন সুরূপ এবং স্বভাবে ছিলেন

তেজস্বী। এঁদের হাতে রোগনিবারক একপ্রকার কবচ থাকত (ঋ ১।১১৪)।

সাধারণতঃ এঁদের পেশা ছিল চাষবাস এবং বিশেষভাবে পশুপালন (গোপালন)। বিবিধ পরিধানের মধ্যে বৃক্ষের বল্কল তাঁদের প্রিয় ছিল। আবার চর্মবাস পরতেন বলে এঁদের কৃত্তিবাসও বলা হত। এঁরা উপবীত ধারণ করতেন। এঁরা জ্ঞানচর্চা করতেন (ঋ ১।১১৪)। এঁরা ভোজনের সঙ্গে বরাহমাংস পছন্দ করতেন। এঁরা ধৈর্যসহকারে হস্তদ্বারা মৃৎশিল্প প্রস্তুত করতেন এমন উল্লেখও আছে (য।১১।৫৭)।

স্বভাবতঃ শান্ত এবং কৃষিনির্ভর হলেও এঁরা প্রচণ্ডরকমের বীর ছিলেন। এঁরাও অশ্বারোহণে নিপুণ ছিলেন। চলাফেরা করবার সময় তাঁদের কটিদেশে পিনাকধনু থাকত সব সময়। রুদ্রজাতিরই একজন নায়ক ছিলেন শিব। এঁদের সম্বন্ধে যজুর্বেদে স্তুতি করা হয়েছে—'হে রুদ্র তোমার নাম শিব। তুমি বজ্রস্বরূপ। তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমাদের হিংসা কোরো না (য ৩।৬৩)।' অথর্ববেদও রুদ্রজাতীয় নায়ককে ভূতপতি, পশুপতি এই সব আখ্যা প্রদান করা হয়েছে (অ ১১।২।১)। বর্ধনকারী শক্তির জন্য রুদ্রদের বলা হত ভব এবং ঘাতকশক্তির জন্য বলা হত শর্ব (অ ৪।২৮।১)।

রুদ্রদের সঙ্গে মরুৎগণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। বারম্বার এঁদের রুদ্রের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা পৃশ্নিমাতার পুত্র ছিলেন এরকমও বলা হয়েছে কোনও কোনও মন্ত্রে; আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে মরুৎগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেন না, কারা এঁদের পূর্বপুরুষ তাও অজানা এবং কারা এঁদের যোদ্ধা করে রথে অভ্যস্ত করলেন, সে বিষয়েও জানা যায় না (ঋ ৫।৫৩।১)। যাই হোক রুদ্রদের সঙ্গে মরুৎগণের যে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। বেদে আমরা 'গণ' নামক এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর উল্লেখ পাই। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৫৬সং সূক্তের প্রথম মন্ত্রে কেবলমাত্র গণ শব্দে মরুৎদের বোঝানো হয়েছে। যজুর্বেদ বলেছেন—গণনামক জাতি রুদ্রদের সহচর ছিলেন এবং রুদ্রেরা তাঁদের উপর অধিকার স্থাপন করেছিলেন বলে তাঁদের 'গণপতি' বলা হত। কিন্তু, 'গণ' সম্ভবতঃ মরুৎদের একটি উপজাতির নাম। যাঁরা প্রকৃত মরুৎজাতীয় ছিলেন, অর্থাৎ যাঁরা অথর্ববেদে 'দেবমারুত' আখ্যায় পরিচিত (অ ৪।২৭।৬), তাঁরা রুদ্রদের একান্তভাবে অধীন ছিলেন বলে মনে হয় না।

বেদসমূহের উল্লেখ থেকে মনে হয়, তাঁরা দেবজনদের সঙ্গে সখ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষা করে চললেও নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতেন। তবে তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই ইন্দ্রের অধীনতা স্বীকার করতেন। ইন্দ্রের প্রতি একান্ত আসক্ত ছিলেন বলে এঁদের বলা হত 'ইন্দ্রবন্ত' (ঋ ৫।৫৭।১)। তাঁরা ইন্দ্রকে জ্যেষ্ঠ করে অবস্থান করতেন বলে তাঁদের 'ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ মরুদ্গণ' ও বলা হত।

মরুদ্গণ অতি প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁদের গায়ের রং ছিল সূর্যের মত উজ্জ্বল শুভ্র (সূর্যত্বচসঃ—অথর্ববেদ) তেমনি ছিল তাঁদের দৈহিক কান্তি। তাঁরা উত্তম আভরণ ধারণ করতেন, বিশেষ করে তাঁদের বক্ষোদেশে আভরণের কিঞ্চিৎ বাহুল্য থাকত। হিরণ্যবর্ণ কবচও তাঁরা ব্যবহার করতেন। তাঁদের শিরে শোভা পেত সুদৃশ্য উষ্ণীষ। তাঁরা নানা আয়ুধে সুসজ্জিত থাকতেন এবং ধনুর্বাণ সর্বদাই তাঁদের সঙ্গে থাকত। তাঁরা সর্বদা পঙ্‌ক্তিতে সৈন্য সাজিয়ে হংসের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে যাতায়াত করতেন, রথও ব্যবহার করতেন। মরুৎদের সৈন্যবল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল এবং তাঁরা প্রচণ্ড বলশালী বলে সুবিদিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পাশ থাকত এবং দুষ্ট বিদ্রোহীদের তাঁরা পাশদ্বারা আবদ্ধ করতেন। তাঁরা অগ্নিদ্বারা যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন বলেও জানা যায় (অ ৩।৩।১)। মরুদ্গণও জলের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁরাও না কি জলপ্রপাতের কাছে থাকতে ভালবাসতেন। দ্যুলোক থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের জলপথ সম্বন্ধে তাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন।

মরুদ্গণ সতত ভ্রমণ করতেন। তাঁদের 'বীলুচিৎ' নামক স্থানে গমন করার উল্লেখ আছে (ঋ ১।৬।৫)। 'বীলু' শব্দে দৃঢ় এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল বোঝায়। এই রকম একটি 'বীলুচিৎ' প্রদেশ বর্তমান বেলুচিস্তান বলে অনুমান হয়। এঁদের একটি দল এ অঞ্চল দিয়ে আরও অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। একটি মন্ত্রে মরুদ্গণকে 'অর্কিন' (অর্কী) বলা হয়েছে (ঋ ১।৩৮।১৫)। এই সব উল্লেখ থেকে মনে হয় এঁরাই ছিলেন মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলের সুপ্রাচীন 'অর্কদ' (Akkadian) জাতির পূর্বপুরুষ যাঁরা সুমেরীয়গণের পরে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীতেও এঁদের আগ্রহ ছিল এবং এঁরা 'ক্ষোণী' নামক বীণা বাজাতেন (ঋ ২।৩৪।১৩)।

এতদ্ব্যতীত আরও কিছু জাতি ছিলেন যাঁরা দেবজনের অন্তর্গত। উদাহরণ-স্বরূপ—বসু, আদিত্য, ঋভু, সাধ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যায়। ঋভুগণ নানারকম মেরামতি কাজ জানতেন, ভাল গানও গাইতেন। এঁরা না কি প্রথমে মর্ত্যবাসীই ছিলেন, পরে স্বর্গলোকে বসতি স্থাপন করেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্তে ঋভুদের সুধন্বার পুত্র বলা হয়েছে। বসুগণও অশ্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁরাও রুদ্রদের মত মৃৎশিল্পে পারদর্শী ছিলেন। অপরাপর জাতিদের সম্বন্ধে তেমন বিশেষ বিবৃতি পাওয়া যায় না।

দেবজনদের মধ্যে আর বিশেষ করে যাঁদের উল্লেখ করতে হয় তাঁরা 'পিতৃগণ' নামে পরিচিত। এঁরা দ্যুলোকের উপরিভাগে 'প্রদ্যু' নামক লোকে বাস করতেন। এঁদের শাসকপদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকতেন তাঁর আখ্যা 'যম'। প্রাচীন পিতৃগণের মধ্যে যেসব সম্প্রদায়ের নাম করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন—নবগ্ব, অথর্বব, ভৃগু, সৌম্য এবং অঙ্গিরস। এঁরা দেবজাতীয়া কন্যা অথবা অপ্সরাদেরও বিবাহ করতেন। কেউ কেউ অসুররমণীদের সঙ্গে সহবাসেও সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। এঁরা সামাজিক বিধান বা পৌরকর্মে অংশগ্রহণ করতেন। পিতৃলোক থেকে দ্যুলোকের সঙ্গে উত্তম রাস্তাঘাট দিয়ে সংযোগ রক্ষা করা হত। অঙ্গিরসগণ যুদ্ধকার্যেও নিপুণ ছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্রের সেনাপতি বৃহস্পতি নিজে অঙ্গিরসবংশীয় ছিলেন। এঁদের যে কেন 'পিতৃ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটা স্পষ্ট নয়। এর একটি কারণ হতে পারে এঁরা দেবগণের উত্তম উপদেষ্টা ছিলেন।

অথর্ববেদ ছয়টি দেবজাতির উল্লেখ করেছেন। যাঁরা পূর্বে অবস্থান করতেন তাঁদের বলা হত 'হেতি'। এঁরাই সম্ভবতঃ 'খেতি' বা হত্তজাতীয়, যাঁরা মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে হিটাইট বলে পরিচিত হয়েছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী দেবজাতির নাম ছিল 'অবিষ্যু'। পশ্চিমে বাসকারীদের বলা হত 'বৈরজা'। উত্তরদেশীয়দের নাম ছিল 'প্রবধ্যস্ত'। ধ্রুব বা অন্তরীক্ষে একটি দেবজাতি ছিলেন তাঁরা 'নিলিম্প' নামে পরিচিত ছিলেন এবং ঊর্ধ্বপ্রদেশে আর একপ্রকার দেবজাতি ছিলেন যাঁদের আখ্যা ছিল 'অবস্বন্ত'।

দেবজনদের পরেই কারা দেবশত্রু ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করে। শত্রুজনদের বহু উল্লেখ বেদে থাকলেও তাঁদের পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া নেই। বৃত্র অসুরজাতীয় পুরুষ ছিলেন। এঁকে হত্যা করেই ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যকে ভয়মুক্ত

করেছিলেন এবং দেবগণের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বীর বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু বেদ এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎস বিবরণটুকুই ধরে রেখেছেন। অসুরজাতি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি।

অসুর বললেই সুর বলে একটি জাতি ছিল বলে ধারণা হয়, কেন না সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি অনুসারে সুর নয় এমন জাতিকেই অসুর বলে স্বীকার করা স্বাভাবিক। কিন্তু সংহিতা কোথাও দেবজাতিকে 'সুর' আখ্যা দিয়েছেন কি না সন্দেহ। বৈদিক সাহিত্যে সুর অর্থে সাধারণতঃ সূর্যকে বোঝানো হয়েছে। অবশ্য পুরাণে দেবগণ সুর আখ্যা পেয়েছেন উপরের অনুমানের উপর ভিত্তি করে; কারণ সুর এবং অসুর—এই দুটি শব্দ কেবলমাত্র সংস্কৃতের ভিত্তিতেই অর্থবহ বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু অসুর শব্দটি আসলে সংস্কৃত নাও হতে পারে। Assyria তে যে অসুরজাতি ছিলেন তাঁদের পূজ্য দেবতারই নাম ছিল অসুর এবং তাঁদের রাজাদের নামের সঙ্গে অসুর শব্দটি যুক্ত থাকত। বৈদিক সভ্যতায় এঁদের দেশের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অসূর্য' লোক। টীকাকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—সূর্যের আলো পৌছায় না এমন অন্ধকারে-আবৃত দেশই হচ্ছে অসূর্য দেশ। কিন্তু অসুরেরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন, তাঁরা এইরকম অন্ধকারপ্রদেশে দেবতাদের ভয়ে আত্মগোপন করবেন, এ অনুমানও সঙ্গত বলে মনে হয় না।

অসুরেরা কৃষ্ণকায় ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কুৎসিত দর্শন ছিলেন এমন উল্লেখ সংহিতায় পাওয়া যায় না। এঁদের মধ্যে বিবিধ জাতির অস্তিত্ব ছিল। বৃত্র, অহি, দেবক, কৃষ্ণ, দাস, করঞ্জ, বঙ্গৃদ প্রভৃতি নানাজাতীয় অসুরদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অসুরনায়ক বৃত্রের পিতার নাম না কি ছিল 'বৃসয়' (ঋ ৬।৬১।৩)। বেঙ্কটস্বামী তাঁর টীকায় এই কথা বলেছেন; কিন্তু স্কন্দস্বামী তাঁর টীকায় এও বলেছেন যে 'বৃসয়' একটি অসুর জাতির নাম। বৃত্রদের সংখ্যা কম ছিল না। দশ সহস্র বৃত্রের উল্লেখ করা হয়েছে—এরা ছিল সৈন্য। কৃষ্ণ নামক অসুরেরও অনুরূপ এমন কি তার পাঁচগুণ বেশি সৈন্যসংখ্যার উল্লেখও আছে। শম্বর অসুরের সঙ্গেই থাকত একশজন দেহরক্ষী। নমুচি ছিলেন দাস জাতীয় অসুর। এঁরও সৈন্যবল কম ছিল না। অতএব যে সমস্ত অসুর সাধারণ গৃহস্থজীবন যাপন করতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল আরও অনেক বেশি। এই কারণেই দেবগণ এঁদের সম্বন্ধে নিরতিশয় শঙ্কা পোষণ করতেন

বেদের সংহিতাভাগ ইচ্ছে করেই এঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের কোনও তথ্য প্রদান করেন নি। ইন্দ্রের কাল পর্যন্ত অসুরেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস পোষণ করতেন। তাঁরা নিশ্চয়ই সভ্যতায় অগ্রসর ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তাঁদেরও ছিল, কেন না এত বড় একটা সভ্যতা কতকগুলি বিশেষ গুণ ব্যতীত বেঁচে থাকতে পারত না।

অসুরদের নিজের ভাষা নিশ্চয়ই দেবভাষার চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল। সে ভাষার কোন পরিচয় আমরা পাই না। অসুরদের যে নাম গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তাদের আসল নাম নিশ্চয়ই অন্য কিছু ছিল। 'বৃত্র' নামটিও উক্ত অসুরের আসল নাম বলে মনে হয় না, দেবতারাই তাঁকে তাঁদের ভাষায় এই নামে পরিচিত করেছিলেন। অতএব, যাঁরা এই সব নামের নিরুক্ত দ্বারা কিছু অর্থ করতে চান তাঁদের ধারণাটাই আসলে ভ্রান্ত বলে মনে হয়। কিছু কিছু নাম হয়ত অসুর ভাষাতেই প্রচলিত ছিল; সম্ভবতঃ 'নমুচি' এইরকম একটি নাম। এটিকে আর্যেতর ভাষার আখ্যা বলেই মনে হয়। গন্ধর্ব, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবজাতীয়দের সকলেই সংস্কৃত নামে পরিচিত হয়ে এসেছিলেন। ক্রমে দেবলোকে সংস্কৃতই সাধারণ ভাষারূপে স্বীকৃত হয় এবং অপরাপর ভাষাগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অসুরেরাও কৃষিকর্ম এবং গো-পালন করতেন। সুযোগ পেলেই দেবগণকে বিপদে ফেলবার জন্য এঁরা দেবধেনু হরণ করে নিয়ে আসতেন। এঁরাও সোম পান করতেন, কিন্তু সুরাই অধিক পছন্দ করতেন। অসুর নমুচি না কি ইন্দ্রের সোমরসে বিষাক্ত সুরা মিশিয়ে তাঁকে অত্যন্ত অসুস্থ করে ফেলেছিলেন। অবশেষে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। ঋগ্বেদে 'কুযব' নামক এক অসুরের নাম পাওয়া যায়। ইনি দেবতাদের ঐশ্বর্য অপহরণ করতেন। ইনি নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে দিয়ে সেখানে তাঁর দুই স্ত্রীর স্নানের ব্যবস্থা করতেন। একবার এইরকম করতে গিয়ে শিফা নাম্নী এক নদীতে তাঁর দুই স্ত্রীই ডুবে মারা যান।

অসুরদের প্রসঙ্গ কেবলমাত্র যুদ্ধ এবং অপরাধের ক্ষেত্রেই উঠেছে। বলা বাহুল্য তাঁরা যুদ্ধবিদ্যায় অতিশয় কুশল ছিলেন। তাঁরাও দেবতাদের মত একপ্রকার লৌহজাল ব্যবহার করতেন এবং তাঁদের হাতেও লৌহময় পাশ থাকত

(অথর্ব ১৯.৬৬)। তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে কোন তথ্যই বেদে প্রদান করা হয় নি। ক্রমে ক্রমে দেবতাগণ অসুরদের সমস্ত জাতিরই উচ্ছেদ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিছুসংখ্যক অসুর বিতাড়িত হতে হতে সুদূর মেসেপোটেমিয়া অঞ্চলে অ্যাসীরীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সেখানেও দেবজাতীয় শাখা মিতান্নীদের সঙ্গে তাঁদের শত্রুতা বহুকাল স্থায়ী হয়েছিল।

অপর একটি শব্দ সংহিতায় পাওয়া যায়—'দেবপীয়ু'। দেবতাদের মধ্যেই যাঁরা দেবজাতির প্রতি শত্রুতা করতেন, তাঁদেরই বলা হত দেবপীয়ু। কোন কোন ব্রহ্মণগ্রন্থে 'দেবমলিম্লুচ্' শব্দটি পাওয়া যায়। এতে জানা যায়, দেবতাদের মধ্যেও চৌর্যবৃত্তি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যেত।

অপরাপর যে সব শত্রুদের কথা বলা হয়েছে তারা নিছক নিম্নশ্রেণীর হিংসক সম্প্রদায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভীষণ ছিল 'যাতু' নামক একটি শ্রেণী, যাদের ঘরবাড়ি ছিল না, যারা বন্যপশুর মত এধার ওধার গমন করত। যা-ধাতুর অর্থ যাওয়া। যাতুমান, যাতুবান যাতুবালা—এই শব্দগুলিতে যাদের কাছে এইরূপ যাতুজাতীয় বহু লোক নিয়োগের জন্য থাকত তাদের বোঝাতো। 'যাতুধান' শব্দের অর্থ যে যাতুদের ধারণ এবং পোষণ করে। মূল শব্দ 'যাতুধান্য' ছিল বলে মনে হয়। যাতুরা নরমাংস ভোজনেও দ্বিধা করত না। অথর্ব বেদেই একস্থানে বলা হয়েছে যে যাতু স্ত্রীলোকগণ তাদের পুত্রের মাংসও ভোজন করত এবং নিজেদের মধ্যে পশুর মত ঝগড়া করত। এদের হিংস্র আচরণ ক্রমে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয় এবং এদের দেহ ও আচরণ সম্বন্ধে নানা ভয়াবহ ধারণা গড়ে ওঠে। এই যাতু বা ইয়াতুরাই তিব্বতীয়দের মধ্যে ইয়েতি নামে চিহ্নিত। এদেরই তুষারমানব আখ্যা দিয়ে নানা গবেষণা, অনুসন্ধান আজকাল চলেছে। আসলে ইয়েতি নামে কোন পশু না থাকবারই কথা। এরা ছিল এক পর্যায়ের ভীষণ অত্যাচারী ও হিংস্র পার্বত্য জাতির মানুষ। এদের দূর করবার জন্য দেবতাগণ এদের ব্যূহে বা camp-এ অগ্নিসংযোগ করতেন এবং অগ্নিতপ্ত লৌহদণ্ড দিয়ে এদের প্রহার করে বধ করতেন। তীক্ষ্ণ অস্ত্র অগ্নিতপ্ত করেও এদের হত্যা করা হত। এরা যেখানে দলবদ্ধ হত সেখানেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। এদের দেখলেই বাণ এবং শল্য নিক্ষেপ করে এদের শেষ করে

দেওয়া হত। দেবগণের অশ্ব এবং গো-সম্পদের প্রতি এদের লোভ ছিল অসাধারণ, কারণ অশ্বমাংস এবং গোমাংস দুটিই এরা ভক্ষণ করত। তা ছাড়া নিছক ক্ষতি করবার উদ্দেশ্যে এই সব পশুকে এরা বিষ প্রদান করেও হত্যা করত। দেবতাদের অপরাপর শত্রুরাও স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদের প্রয়োজনমত দেবতাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করত। বরুণকে না কি ইন্দ্র অগ্নিতপ্ত সীসার গোলক বা দণ্ড প্রদান করেছিলেন, যেগুলি নিক্ষেপ করে যাতুদের হত্যা করা হত (অ ১।১৬)।

অনুরূপ আর একটি শ্রেণী ছিল যাদের বলা হত অংত্রিন (অত্রী বা অতাত)। এরাও একইভাবে ভ্রাম্যমান অবস্থায় দেবতাদের অনিষ্ট সাধন করত। কিমিদিন (কিমীদিন) নামক এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী জোর করে বা ছলনা করে অপরের বস্তু অপহরণ করত। 'কিম্ ইদানীং' অর্থাৎ 'এখন কি পাওয়া যায়' —এই অর্থে না কি এদের নাম দেওয়া হয়েছিল কিমিদিন। কিন্তু এটা কতখানি যুক্তিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এটি প্রাক্ সংস্কৃত যুগের আখ্যা হওয়াই স্বাভাবিক।

দস্যু নামক একটি বিশেষ শ্রেণী ছিল, যারা ছিল একান্তভাবে হিংস্র ও বিনাশকারী। এদেরও বড বড় দল ছিল, তারা নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকত। পণিরা ছিল এই ধরনের এক দুর্ধর্ষ দস্যুসম্প্রদায়। ইন্দ্রই এদের স্বর্গরাজ্য থেকে উচ্ছেদ সাধন করেন।

রক্ষস, যাদের পরবর্তীকালে রাক্ষস বলা হয়েছে তারাও এক শ্রেণীর দস্যু ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। টীকাকারগণ বলেন—যারা স্বার্থের জন্য পরের অর্থ আত্মসাৎ করে এবং পরকে হনন করে নিজেদের রক্ষা করে, তারাই রক্ষস।

পিশাচ, ক্রব্যাদ, গ্রাহী প্রভৃতি জাতিরা যে কোনও মাংস ভক্ষণ করে বেঁচে থাকত। দানবদের সঙ্গে যারা বাস করত তাদের বলা হত সদম্বা (স-দানবাঃ)। এক ধরনের কপট ব্যবহারকারী স্ত্রীলোক ছিল তাদের বলা হত শশদানা।

এইরকম আরও অনেক সমাজবিরোধী শত্রুর অস্তিত্ব স্বর্গাঞ্চলে ছিল। কিন্তু, এক অসুর ভিন্ন অন্যান্য সব সম্প্রদায়ই পশুর তুল্য নিকৃষ্ট ছিল; সুতরাং অসুরগণ কারোর সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হবার অবকাশ পান নি। এঁরা কিছুতেই দেবতাদের মেনে নিতে পারেন নি। সেরকম মনোভাব দেখালে হয়তো এঁরাও দেবজন

বলে বিবেচিত হতেন, কিন্তু এঁরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখবার জন্য দেবগণের বিরুদ্ধাচরণ করে গেছেন। বেদের সংহিতা এঁদের বিরুদ্ধে যতই বলুন না কেন তথাপি সন্দেহ থেকে যায় এঁরা কি সত্যিই কেবল হিংস্থক, অপকৃষ্ট একটা জাতি ছিলেন ?

ইন্দ্রের সময় আমরা স্বর্গ শাসনের একটা বিধিবদ্ধ সুশৃঙ্খল রীতি দেখতে পাই। দেবতারা সকলেই ছিলেন রাষ্ট্রের অধীন। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে দেবগণকে 'রাষ্ট্রভৃত' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁরা সকলেই একটি রাষ্ট্রের অধীন ছিলেন এবং রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতেন। আর একটি মন্ত্র থেকে বোঝা যায় দেবগণ সকলেই একবৃত ছিলেন। দেবতা এবং দেবজনদের মধ্যে ইনি প্রথম, ইনি দ্বিতীয় এইরূপ ভেদ ছিল না। যদিচ তাঁদের নানারূপ পদগৌরব ছিল, তথাপি রাষ্ট্রের চোখে তাঁরা সকলেই এক ছিলেন (অ ১৩।৪।১৩)। তাঁদের নীতি ছিল এই যে, এই সূর্যের নিচে যত দেবতা আছেন তাঁরা সকলেই সম্মিলিতভাবে এক অধিকার ভোগ করবেন। আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা সূর্যের বন্দনার মত মনে হলেও অথর্ববেদের ত্রয়োদশ খণ্ডের চতুর্থ সূক্তটি এই মতবাদই প্রচার করছে। এই সূক্তের শেষ মন্ত্র—'সর্বে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি'। এখন যেমন সরকারি কর্মচারিগণ সরকারের অধীনে কাজ করেন তখনও রাষ্ট্রনিযুক্ত বহু দেবজাতীয় কর্মচারী ছিলেন। এঁরা খুব কঠোর শাসক ছিলেন এবং যাঁরা দোষ করতেন তাঁদের এঁরা কড়া শাসন করতেন। এই কারণে একটি মন্ত্রে রাষ্ট্রনিযুক্ত কর্মীদের 'উগ্রংপশ্য' বলা হয়েছে (অ ৬।১১৮)। এমন কি অপ্সরাগণ স্ত্রীলোক হলেও যখন তাঁরা রাষ্ট্রের কাজে নিযুক্ত থাকতেন তখন তাঁরাও উগ্রদর্শিনী হতেন।

অথর্ববেদের সপ্তমকাণ্ডের দ্বাদশসূক্তে রাষ্ট্রসভা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। 'সভা' এবং 'সমিতি'—এই দুটিকে বলা হয়েছে প্রজাপতির দুহিতা। বেদসংহিতা অনুসারে প্রজাপতির স্থান ছিল ইন্দ্রের পরেই। তিনিই ছিলেন ইন্দ্রের সেনাপতি ; পুরোহিত এবং উপদেষ্টা। অতএব দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিগুলির উপর কর্তৃত্ব করতেন প্রজাপতি। এই সভাসমিতিতে প্রত্যেকে সমবেত হয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন এবং পিতৃগণও সেসব স্থানে সমাগত হতেন। প্রজাপতি স্বয়ং পিতৃগণের অন্যতম ছিলেন। এই সভাকে দেবগণ তাঁদের ইষ্ট

বা হিতকারী বলে জানতেন। এই সভার সদস্যগণ 'সবাচসঃ' অর্থাৎ আলাপ-আলোচনায় একমত হবেন, এটাই ছিল কাম্য। এই সভাসমিতিতে যাঁরা সমাসীন হতেন তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব স্থাপন করতেন এবং বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করতেন। ইন্দ্র যেন এই সংসদের প্রত্যেকের প্রতি সদয় থাকেন, এই ছিল সকলের মনোগত বাসনা। সভা-সমিতির কাজে যাতে সকলে নিবিষ্টভাবে যুক্ত থাকেন এবং একান্তভাবে মনঃসংযোগ করেন সেইরকম অনুবোধ জানান হত। যজুর্বেদ 'জনরাট্' অর্থাৎ জনানুমোদিত রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন (য ৫।২৪)। ঋগ্বেদ ইন্দ্রকে 'একরাট্' বা 'স্বরাট্' বলেছেন। এর মানে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা ইন্দ্রের উপরেই প্রদত্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে বরুণকেও সম্রাট বলা হয়েছে। সম্রাট অর্থে সকলের রাজা বোঝায়। বরুণকে রাজা বলে স্বীকার করা হত। বরণীয় বা শ্রেষ্ঠ অর্থেই বরুণ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র, প্রজাপতি এবং বরুণ—স্বর্গরাজ্যের এই তিনজনই ছিলেন প্রধান নায়ক। অথর্ববেদের প্রথম কাণ্ডের ৩১ সূক্তের চারজন আশপালের উল্লেখ করা হয়েছে। 'আশা' শব্দের অর্থ হচ্ছে দিক। একটি সামবেদীয় ব্রাহ্মণের মতে দিকপাল চারজন ;—পূর্বে অগ্নি, দক্ষিণে যম, পশ্চিমে বরুণ এবং উত্তরে সোম। মনুর মতে লোকপাল ছিলেন আটজন ;—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, সূর্য, বরুণ, পবন, কুবের এবং সোম। যাই হোক, এটা ধারণা করা যায় যে সমগ্র স্বর্গরাজ্যের চতুর্দিকে এক একজন শাসক নিযুক্ত থাকতেন। তাঁরাই ছিলেন আশাপাল।

দেবগণের জীবনের আদর্শ যে ঠিক কি প্রকার ছিল সেটি নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। আমরা যে বেদসাহিত্য পাচ্ছি তা কেবলমাত্র বৃত্রবিজয়ী ইন্দ্রের সমসাময়িক। দেবসভ্যতা তার বহুশত বৎসর পূর্বেই গড়ে উঠেছে। এই যে ইতিহাস, এ একেবারে অন্ধকারে আবৃত বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইন্দ্রের সময় যে স্বর্গরাজ্য, সে একান্ত কৃষিনির্ভর ; তথাপি ধনরত্নের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায় প্রায় সর্বত্রই। ঐশ্বর্য সেখানে উপচীয়মান, বিশেষ করে স্বর্ণের বিপুল সংগ্রহ এই হিমাচল সভ্যতায় বিদ্যমান ছিল। দেবজনেরা নানা অলঙ্কারে শোভিত হতেন, তাঁদের রথ, অশ্ব উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কারে সজ্জিত হত ; দেবগৃহের বাহিরে, ভিতরে স্বর্ণের স্থাপত্যকর্ম বিপুল শোভা বিস্তার করত। কিন্তু এই ঐশ্বর্য ইন্দ্র একা ভোগ করতেন না, সকলের মধ্যে ঐশ্বর্যরাশি বণ্টন করে দেবার প্রথা ছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে জনরাষ্ট্রে রাষ্ট্রনায়ক একাধিপত্য বিস্তার করতে পারতেন না। এই যে বিপুল ঐশ্বর্য এর সঞ্চয় হত কোথা থেকে? মর্ত্য থেকে কি এত ধনরত্ন স্বর্গরাজ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হত। নিশ্চয়ই অসুরগণও এত ঐশ্বর্যের মালিক ছিলেন না যে তাঁদের লুণ্ঠন করে দেবতারা অগণিত ঐশ্বর্যের অধিপতি হতে পারতেন। এর সূত্র যে কোথায় তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। কোথা থেকে যুগ যুগ ধরে এই সুবর্ণরাশি সঞ্চিত হয়েছিল তার সঠিক বৃত্তান্ত কেউ বলতে পেরেছেন কি না জানি না।

দেবতারা সাধারণভাবে কতকগুলি মানবিক নীতি মেনে চলতেন। অহিংসা তাঁদেরই শ্লোগান ছিল। শুধু যে অহিংসাই তাঁদের আদর্শ ছিল তাই নয়, ঋত বা সত্যকেও তাঁরা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য দিতেন। পাপসমূহ যাতে দূর হয় তার অক্লান্ত চেষ্টা দেবতারা করতেন। ঋগ্বেদেই প্রার্থনা জানান হয়েছে—বিশ্বের পাপসমূহ দূর কর, যা ভদ্র তাই আমাদের কাছে আসুক (ঋ ৫।৮২)। আক্রান্ত না হলে আক্রমণ করাটা তাঁদের রীতি ছিল না, যদিচ অসুরদের বেলায় তার ব্যতিক্রম মধ্যে মধ্যে ঘটত। মর্ত্যভূমিতে তাঁরা বসতি স্থাপন করলেও সর্বদা বন্ধুভাবেই থেকেছেন। সেখানে তাঁরা সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নি। দেবজনদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধও অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ছিল, কোন বিরোধের অবকাশই এঁদের মধ্যে দেওয়া হত না।

এরকম একটা মতবাদ প্রচারিত হয়েছে যে লিখিত ভাষার প্রচলন সেযুগে ছিল না এবং সবই না কি শ্রুতিতে ধরে রাখা হত। এটা সর্বৈব ভ্রান্ত ধারণা বলে মনে হয়, কেন না দেবগণের বহু শাখাই বিদ্বান ছিলেন। বিজ্ঞান শব্দটির ব্যবহার সংহিতায় অনেকবার পাওয়া যায়। গন্ধর্বেরা যথেষ্ট বিদ্যাচর্চা করতেন। রাজা বিশ্ববসু মহাজ্ঞানী ছিলেন। এতবড় একটা রাষ্ট্রের পরিচালনা কোনরূপ লিখিত ভাষা ছাড়াই করা হত, এটা কল্পনাই করা যায় না। তা ছাড়া, দেবগণের আদি ভাষা সংস্কৃত ছিল না। একটি সাধারণ ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকে দাঁড় করাতে কম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় নি। কবি বা জ্ঞানী শব্দটি সংহিতায় বারে বারে দেখা যায়। লিখিত ভাষা নেই অথচ কবি—এটাই বা কি করে হতে পারে? সংহিতার ভাষা অত্যন্ত উন্নত এবং মন্ত্রগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন। স্বভাবকবির মুখে মুখে বর্ণনা এইরকম সুসম্বদ্ধ হতে পারে না।

এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা যে সংস্কৃত মন্ত্র সংহিতায় পাচ্ছি, আদিতে সে ভাষায় মন্ত্রগুলি রচিত হয় নি। সেগুলি তখনকার কথ্যভাষায় রচিত হয়েছিল, যার প্রমাণ গ্রামগেয় গানগুলি থেকে পাওয়া যায়। গ্রামগেয় মন্ত্রগুলিই হচ্ছে ঋগ্বেদের আদিতম মন্ত্র। ইন্দ্রের সময় আমরা যেসব গ্রামগেয় মন্ত্র পাচ্ছি তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ গ্রাম্য শব্দগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। একই মন্ত্রের একাধিক গ্রামগেয় রূপ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় অনেকে দুদিকই বজায় রাখতে চেয়েছেন।

গ্রামগেয় মন্ত্রের সংখ্যা মোটেই কম নয়, বেশ কয়েক শত। এই পর্যায়ের মন্ত্রগুলিকে পণ্ডিতগণ তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন নি। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে এইগুলি পৃথিবীর একটি আদিমতম জাতির আদিতম লোকসঙ্গীতের প্রতীক। লোকসঙ্গীত হওয়াতেই এই মন্ত্রগুলিতে যেসব শব্দ আছে সেগুলি সংস্কৃতভাষা থেকে ভিন্ন প্রকারের এবং এগুলি দেবজাতীয় ব্যক্তিদের কথ্যভাষার স্মৃতি বহন করছে।

এ পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে এই শব্দগুলি আসলে সংস্কৃত শব্দের বিকার, অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দগুলি গায়কদের (উদ্গাতাদের) কণ্ঠে বিকৃত হয়ে এই ধরনের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদ মেনে নিতে পারা যায় না, কারণ যে সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণে এত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে গায়কগণ সেগুলি অমান্য করতে যাবেন কেন? এ ছাড়া গায়কদের কণ্ঠে গান করবার সময় বিকৃতি যে এইরকমই হবে তারও কোন অর্থ নেই। যদি বিকৃতিই ধরে নিই তাহলে এর ব্যাখ্যা গ্রামগেয় হবে কেন? এই নামকরণ থেকেই কি বোঝা যায় না যে এইগুলি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের গান এবং গাওয়াটাও গ্রাম্যস্তরের। এই গানগুলি গাইবার আর্টও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সাধারণতঃ প্রচলিত রীতি অনুসারে গান গাওয়া হয়ে আসছে আরোহণক্রমে। কিন্তু গ্রামগেয় গানের ক্ষেত্রে রীতিটা বিপরীত, অর্থাৎ এই গানগুলি গাওয়া হত অবরোহণক্রমে। যেটা আমাদের সঙ্গীতে মধ্যমস্বর সেটাকে যদি একটি সপ্তকের শেষ চড়া স্বর ধরা যায় তাহলে অবরোহণক্রমে তার স্বরগ্রাম দাঁড়াতো এইরকম,—মা, গা, রে, সা, খাদের ধা, খাদের নি এবং খাদের পা। গ্রামগেয় গানের ক্ষেত্রে একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, মধ্যম থেকে ক্রমাগত নেমে স্বরগ্রাম

সা-তে এসে পৌঁছোতো এবং তারপর সেটা নি-তে না নেমে সোজা নেমে আসত মন্দ্র বা খাদের ধা-তে। এর পর প্রয়োজন হলে স্বরকে নি-তে চ'ড়িয়ে নেওয়া হত। পঞ্চম পর্যন্ত গলা নামানো সম্ভব ছিল না, সেই কারণে কোনও গানই খাদের পঞ্চমে স্থিতিলাভ করত না। আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় যে এই জাতীয় গানে কোমল বা বিকৃতস্বরেব প্রয়োগ হত না। বৈদিক সাহিত্যের শিক্ষাকারগণ বহু পরবর্তী কালে তৎকালীন লৌকিক স্বরগ্রামের সঙ্গে তুলনা করে সামিক স্বরগ্রাম কি রকম হতে পারত সেটি নির্ণয় করেছিলেন এবং সেই রীতিকে প্রয়োগ করে বর্তমান স্বরগ্রামে এই গায়নরীতি কি রকম দাঁড়াবে সেটিও স্থির করা যায়। এই বিধিতে যদি গ্রামগেয় গানগুলিব স্বরলিপি প্রস্তুত করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই গানের প্রকৃতিতে লোকসঙ্গীতের লক্ষণই ফুটে উঠেছে। এটিও প্রত্যক্ষ করা যাবে যে এটি একটি বিশেষ ধরনের লোকসঙ্গীত যার প্রথাই ছিল অবরোহণক্রমে বিচরণ এবং এটাও ধারণা করবার অবকাশ হবে যে অতি প্রাচীনযুগের হিমাচল সভ্যতায় এমন বহুজাতির বসবাস ছিল, যাঁরা প্রাক্-সংস্কৃতভাষায় কথা বলতেন এবং তাঁদের গানের ধারাও সম্পূর্ণ অন্য রকমের ছিল। এইরকম একটি আদিমতম ভাষা, যা দেবজাতীয় আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাতে রচিত বহু মন্ত্রই সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুরক্ষিত হয়েছে এমন কতকগুলি মন্ত্র যেগুলি আচার-আচরণে প্রতিনিয়ত প্রয়োগ করা হত। এগুলি নিষ্ঠাবশতই অবিকৃত রেখে দেওয়া হয়েছে এবং যাতে এগুলির সুর অবিকৃত থাকে এই কারণে এই স্বল্পসংখ্যক গানের একেবারে স্বরলিপি করে রেখে দেওয়া হয়েছে। এই স্বরলিপিও বোধ করি পৃথিবীর একটি আদিমতম স্বরলিপি, যা আজ পর্যন্ত রক্ষিত আছে। যদি প্রশ্ন তোলা হয় কেন এইগুলিকে আলাদা করে রেখে দেওয়া হল, তাহলে উত্তরে বলতে হয়— এ যুগে যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে দেশীয় ভাষা থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত মন্ত্রাদির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেই আদর্শ অনুসারেই উক্ত প্রাকৃত মন্ত্রগুলিকে এবং সেগুলির গায়নপদ্ধতিকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। এই মন্ত্রগুলিকেই কেবলমাত্র উদ্গাতাগণ আচরণ করতেন যাগযজ্ঞের অদিম ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে। আসল বেদগান হচ্ছে এটাই।

অনেকের ধারণা বেদমন্ত্র মাত্র তিনস্বরে গাওয়া হত। এটি অত্যন্ত ভ্রান্ত

ধারণা। উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত—এই তিনটি হচ্ছে আবৃত্তির স্বর। লঘুগুরু মাত্রায় পাঠ করার কালে এইভাবে স্বর করে পড়বার একটি রীতি ছিল। কিন্তু গান করবার বেলায় ছয়টি স্বরেরই প্রয়োগ হত। তিনস্বরে আবৃত্তি সকলেই করতে পারতেন, কিন্তু গানের বেলায় কেবলমাত্র যাঁরা এগুলিকে গাইতে শিখেছেন তাঁদেরই নিয়োগ করা হত। তাঁদেরই বলা হত উদ্গাতা। এই বিদ্যা ছিল গুরুমুখী। স্বরগুলি যথাযথভাবে না লাগলে সমস্তই বেসুরো হয়ে যেত এবং যেহেতু লৌকিক কোনও যন্ত্রের সঙ্গে এইসব গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল না বা প্রচলিত স্বরগ্রামের সঙ্গে গ্রামগেয় গানের স্বরগুলির কোনও মিল নির্দিষ্ট হয় নি—এই কারণে ভালভাবে না শিখলে গান বেসুরো হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এই সব স্বরকে 'স্বর'ই বলা হত না, বলা হত 'যম' (ইয়ম)।

যে আলোচনা করা হল তাকে উদাহরণ সহযোগে বিশদ করলে বুঝতে সুবিধা হবে। সামবেদের আগ্নেয়কাণ্ডের প্রথম মন্ত্র হল এইটি—

অগ্ন অ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সংসি বর্হিষি॥

এর গ্রামগেয় রূপ হচ্ছে এইরকম—

ওগ্নাই আ য়াহী বীইতোয়াই গৃণানো হব্যদাতোয়াই।
নাই হোতা সাৎসায়ি বাহীষী॥

এখানে শব্দগুলির বৈষম্যই এইভাবে ঘটেছে—

অগ্ন=ওগ্নাই
বীতয়ে=বীইতোয়াই
হব্যদাতয়ে=হব্যদাতোয়াই
নি=নাই
সংসি=সাৎসাই
বর্হিষি=বাহীষী

এই যে শব্দের উচ্চারণগত প্রভেদ একে গায়কের বিকার বললে সত্যভাষণ করা হয় না। গায়কের উচ্চারণের বিকৃতি, যা সাধারণতঃ ঘটে থাকে, তার

রূপ আলাদা এবং সেটা বিকৃতিই, তাকে গ্রামীণ উচ্চারণরীতি বলা হয় না। যেমন কোনও গানে 'সীতাপতি' ওস্তাদের গলায় তা হয়ত জড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু উচ্চারণটা—'সাইতাপত'াই' —এইরকম হবে না। স্পষ্টই বোঝা যায়, গ্রাম্যভাষায় 'অগ্নিকে' বলা হত 'ওগ্নাই' এবং পরবর্তী কালের সংস্কৃতভাষায় যেগুলি ই-কার বা এ-কার, সেগুলি 'আই' ধ্বনিতে পরিস্ফুট হত গ্রামীণ-ভাষায়। 'ইন্দ্র'কে—গ্রামগেয় গানে সর্বত্র 'আইন্দ্র' বলা হয়েছে- এইটাই ছিল তাঁর আসল নাম। 'ইন্দ্র' হচ্ছে শাস্ত্রীয় নামকরণ।

উপরে গ্রামগেয় গানের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেটাই তার সমগ্র রূপ নয়, তার সঙ্গে স্তোভ যোগ করা হত এবং অক্ষরের পুনরাবৃত্তিও ঘটত লোক-সঙ্গীতের ধরনে। সমগ্র রূপটি ছিল এইরকম—

ওগ্নাই। আয়াহীবীইতোয়াই। তোয়াই। গৃণানোহ। ব্যদাতোয়াই। তোয়াই। নাইহোতাসা। সায়ি। বা ঔহোবা। হীষী॥

এখানে দেখা যাচ্ছে, একটি শব্দকে খণ্ড করে একাধিকবার উচ্চারণ করবার প্রথা ছিল ; যেমন 'তোয়াই' এই অংশটি (বীতয়ে, হব্যদাতয়ে, —এই দুটি শব্দের খণ্ডরূপ)। 'ঔহোবা' —এই ধ্বনিটিকে স্তোভ বলা হত। গ্রাম্যগানে ঔহোবা, অহোবা, ইড়া, হাই—প্রভৃতি উৎসাহব্যঞ্জক ধরনের প্রচলন ছিল। প্রাক্-সংস্কৃতপ্রথায় এগুলিকে নানা সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যোগ করা হত। দেবতাবর্গীয় আর্যগণও এই প্রথাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

এই গ্রামগেয় গানটির সুর দিয়েছিলেন ঋষি গোতম। এইভাবে একই মন্ত্রের একাধিক বা অপরাপর মন্ত্রের সুর বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন ব্যক্তিরা প্রয়োগ করে গেছেন, সেগুলি তাঁদের নামের সঙ্গে বা সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে পরিচিত হয়েছে। আরও পূর্ব থেকেই এই মন্ত্রগুলি এইভাবে রচিত হয়েছিল।

অরণ্যগেয় গান বহুলাংশে কৃত্রিম এবং এগুলি প্রধানতঃ বেশি স্তোভ সংযোগ করে গাওয়া হত। যেহেতু গ্রামগেয় নামক এক প্রকার গানকে রক্ষা করা হয়েছিল সেহেতু অরণ্য বা আরণ্যগেয় নামে একটি প্রকারভেদের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আসলে গ্রামগেয়ই হচ্ছে একটি বিশিষ্ট গ্রামীণ রূপ, অপরটি নয়।

অনেকে বলতে চান গ্রামে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞে এইসব মন্ত্র গাওয়া হত বলেই এর আখ্যা গ্রামগেয়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়, কেন না তাহলে অন্যান্য স্থানে

গেয় মন্ত্রগুলিরও বিশেষ বিশেষ আখ্যা পাওয়া যেত। আসলে এগুলি অকৃত্রিম গ্রাম্যগীতি বলেই এগুলি গ্রামগেয় বলে প্রচারিত হয়ে এসেছে।

গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয় পর্যায়ে প্রায় সাড়ে ছয়শোর মত লোকগীতি বৈদিকযুগের সঙ্গীত সংগ্রহে পাওয়া যায়। এইগুলি অগ্নি ও ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে রচিত। প্রধানতঃ অগ্নি ছিল বৈদিক সভ্যতার বৃহত্তম আবিষ্কার ও বিস্ময়; তাই অগ্নিকে সম্বোধন করে বহু পদই রচিত হয়েছিল। ইন্দ্র ছিলেন সকলের রক্ষাকর্তা এবং বলবীর্যের প্রতীক। এই কারণে তাঁকে ঘিরেও যথেষ্ট পদ রচনা হবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। বেদমন্ত্রগুলি ঋষিদের রচনা—এ ধারণাও বোধকরি ঠিক নয়। আসলে তাঁরা মন্ত্রগুলি পেয়েছিলেন এবং ব্যবহার করেছিলেন। এই কারণেই তাঁদের নামের সঙ্গে এই মন্ত্রগুলি যুক্ত হয়ে গেছে। কোথায়, কিভাবে তাঁরা এই মন্ত্রগুলি রচনা করেছিলেন তা জানা যায় না। যে ভাষায় এগুলি রচিত হয়েছিল, একমাত্র ওই ছয়শো, সাড়ে ছয়শো মন্ত্র ছাড়া আর কোনটিই অকৃত্রিমভাবে রক্ষিত হয় নি, সবই সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এই মন্ত্রগুলিকে দেবসম্প্রদায়ভুক্ত এবং মানবসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় সুবিধার্থে বার বার সম্পাদনা করেছেন এবং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নিবদ্ধ করেছেন। আজকে আমরা যে ঋগ্বেদ পাই তা আদি বেদমন্ত্রের সঙ্কলন নয়, তা একটি ভিন্নভাবে সম্পাদিত কৃত্রিম ভাষায় রচিত মন্ত্রের সঙ্কলন। দেবতা এবং দেবজনদের বহুভাষা একদা দেবলোকে প্রচলিত ছিল। এইসব ভাষাগুলিকে বিচার করে একটি সাধারণ ভাষা প্রণয়ন করা হয়েছিল, তারই নাম 'সংস্কৃত'। মর্ত্যলোকেরও বহু প্রাকৃতভাষার সঙ্গে দেবভাষাগুলির সাদৃশ্য ছিল এবং সংস্কৃতভাষা তাঁরাও গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রাকৃত ভাষাগুলি মর্ত্যে দেবসভ্যতা প্রসারের পর বহুল পরিমাণে দেবতা ও দেবজনদের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করা মর্ত্যবাসীদের পক্ষে সুগম হয়েছিল।

যে গ্রামগেয় গানগুলি আমাদের মধ্যে চলে এসেছে তার কতখানি সংস্কৃত পরিমার্জনা ঘটেছে আমরা জানি না, তবে একথা সত্য যে এর সুরগুলি সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের প্রতীক এবং এরকম গায়নপদ্ধতি একমাত্র লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেই সম্ভব ছিল। এই পদ্ধতি কতদিনের প্রাচীন এবং কারা এর উদ্ভাবক তাও আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে আলোকপাত খুব কম হয়েছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সঙ্গীতের, বিশেষ করে বেবিলন সভ্যতায় প্রচলিত সঙ্গীতে এইরূপ গায়নপদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায় কি না তাও আজ পর্যন্ত কেউ নিরূপণ করেন নি। এ সম্পর্কে সুবিস্তৃত অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

অথর্ববেদের নবম কাণ্ডে বলা হয়েছে বাক্ চার প্রকার। মনীষী ব্রাহ্মণগণ এগুলির সঙ্গে পরিচিত। তিনপ্রকার বাক্ বা ভাষা সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত করা হয় নি; কেবল বলা হয়েছে চতুর্থ প্রকার ভাষাই মনুষ্যগণ বলে থাকেন। এই ভাষাগুলি নিশ্চয়ই নেহাৎ কথ্যভাষা ছিল না, লিখিত ভাষাও বটে। সম্ভবতঃ এই মনুষ্যভাষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ দেবভাষাও এর অন্তর্গত। এটিও অনুমান করা যায় যে ব্রাহ্মণগণ এই চারটি ভাষার সংযোগেই একটি সর্বসাধারণের ভাষা প্রণয়ন করেন। অথর্ববেদে লোকসমূহের মধ্যে দৈবী ভাষার প্রচার সম্বন্ধে বলা হয়েছে (অ ৬।৬১।২); এই দৈবী ভাষাই হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা।

সংহিতা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি, যদিচ ঈশ্বর শব্দটি প্রভু অর্থে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে। অথর্ববেদের দশম কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্তে ব্রহ্ম কি সে সম্বন্ধে একটা তত্ত্বের নির্দেশ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। পুরুষকে কেন্দ্র করেই ব্রহ্মের পরিকল্পনা। পুরুষ কি? পুরুষই হচ্ছেন দৈবী শক্তির উৎস। পুরুষই হচ্ছেন দেবতাদের শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বের অর্থাৎ সমস্ত সদ্গুণের এবং সমস্ত বলবীর্যের প্রতীক। এই পুরুষ তাঁর পুরুষকার দ্বারা সমস্ত অসত্য অতিক্রম করে সত্যকে নির্ধারণ করছেন এবং মৃত্যুকে পরাস্ত করে অমৃতকে অর্থাৎ জীবনীশক্তিকে আহরণ করছেন। এই পুরুষকার দ্বারাই দেবগণ দিবা, রাত্রি এবং পারিপার্শ্বিক যা কিছু অবস্থিত আছে সেই সবকিছুকেই অবধারণ করতে সমর্থ হচ্ছেন। নিজের সেবাশক্তিকেও উদ্দীপিত করছে এই পুরুষসত্তা। অথর্ববেদ প্রশ্ন রাখছেন,—কে এই ভূলোককে এবং দিব্যলোককে শোভাসম্পদে আবৃত করেছেন? কেই বা পুরুষকে এই বিরাট বিরাট পর্বতসমূহ অতিক্রম করবার সাহস প্রদান করছেন? আর, কেই বা তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত করছেন? কার সহায়তায় পুরুষ মেঘপুঞ্জের বিপুল বর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হচ্ছেন? কেই বা তাঁকে সোমরস উৎপাদনের কৌশল পরিজ্ঞাত করাচ্ছেন? কে তাঁকে যজ্ঞে প্রবৃত্ত করছেন এবং তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধার সঞ্চার করছেন?

কেই বা তাঁর মননশক্তিকে জাগ্রত করছেন? কে তাঁকে শ্রোত্রীয় করে তুলছেন? কে তাঁকে তাঁর পরম ইষ্ট কি তা জানতে উদ্বুদ্ধ করছেন? কে তাঁকে অগ্নির ব্যবহার শিখিয়েছেন? কেই বা তাঁকে সম্বৎসরব্যাপী এই কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করেছেন? এ সবের উত্তরে সংহিতাই বলছেন যে ব্রহ্মই তাঁকে শ্রোত্রীয় বা সুবিজ্ঞ করে তুলেছেন, ব্রহ্মই তাঁকে পরম হিতের দিকে পরিচালিত করছেন, ব্রহ্মই তাঁকে অগ্নির প্রয়োজনীয় ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে তুলেছেন এবং ব্রহ্মই তাঁকে নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ নিয়মে জীবনধর্ম পালন করে কাল যাপন করতে শিখিয়েছেন। ব্রহ্মই দেবগণের মধ্যে এবং দেবজনদের মধ্যে প্রবিষ্ট রয়েছেন। ব্রহ্মই তাঁকে বল থেকে বিচ্যুত করছেন, আবার ব্রহ্মই তাঁকে বীর্যবান ক্ষত্ররূপে অধিষ্ঠিত করছেন। ব্রহ্মই তাঁকে মর্ত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করছেন, দ্যুলোকে স্থাপন করছেন এবং ব্রহ্মই তাঁকে ঘিরে তাঁর চতুর্দিকে অবস্থিত রয়েছেন। অতএব, পুরুষ এই ব্রহ্মের সঙ্গে সর্বশক্তি অর্জন করছেন এবং সর্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করছেন। এই ব্রহ্মের সত্তার মধ্যেই পুরুষের সত্তা বর্তমান। এই পরম শক্তিমান অক্ষয় ব্রহ্মকে যে পুরুষ জ্ঞাত হন তাঁর দৃষ্টি গভীরে পৌছোয়, তাঁর বংশবৃদ্ধি হয় এবং তাঁর প্রাণশক্তি প্রাচুর্যসম্পন্ন হয়। দৃষ্টি তাঁকে আর কখনও পরিত্যাগ করে না। জরাগ্রস্ত হবার পূর্বে প্রাণ তাঁকে কদাচ পরিত্যাগ করে না। ব্রহ্মই এই পুরুষের মুখ্যস্বরূপ, তাঁকে জানতে হবে। দেবতাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের পরিধি আটটি চক্রাকার পুরীতে বিস্তৃত। সেগুলিতে নয়টি করে দ্বার আছে। তার ভিতরে হিরণ্যকোষগুলি (সোনার সিন্দুক) তিনটি করে চক্রের উপর অধিষ্ঠিত (যাতে সেগুলি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায়)। এই হিরণ্যসম্পদযুক্ত পুরীতেই ব্রহ্ম প্রবিষ্ট রয়েছেন। অর্থাৎ দেবগণ স্বীয় বীর্যে তাঁদের ঐশ্বর্যকে সুরক্ষিত রেখেছেন। সেই স্বর্গলোক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

এখানে পুরুষ শব্দে মনুষ্যত্বের সর্বাধিক গুণ আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বই হচ্ছে দেবগণের পৌরুষ। কিন্তু এই পৌরুষকে যে বিজ্ঞান ও মননশক্তি দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হত, তাকেই সংহিতা ব্রহ্ম নাম দিয়েছেন। যাকে ইংরেজিতে wisdom বলা হয়, ব্রহ্ম শব্দে সেটাকেই বোঝানো হয়েছে। গন্ধর্বগণ মহাজ্ঞানী ছিলেন, তাই অথর্ববেদের একটি মন্ত্র বলছেন, 'ব্রহ্মের সহিত গন্ধর্ব বিশ্বাবসুকেও নমস্কার করে' (অ ১৪।২।৩৫)। পরবর্তী যুগে

উপনিষদ্ এই ব্রহ্ম বা দেবতাদের চিৎশক্তিকে এক দুজ্ঞের্য় রহস্যময় দার্শনিকতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। সংহিতার ব্রহ্ম কিন্তু অতিশয় স্পষ্ট একটি আত্মিক শক্তি। এই কারণেই ব্রহ্ম শব্দে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এবং দেবতা সকলকেই সময়-বিশেষে সূচিত করা হয়েছে। এমন কি, বেদের স্তোত্রসমূহ যা তাঁদের অন্তরের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম উচ্ছ্বাস তাকেও ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এই মন্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁরা বলীয়ান হতেন বলেই তাঁদের বার বার কবি বলা হয়েছে। সামবেদের ঐন্দ্রপর্বে ৩৩০ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে—খ্যাতিমান বশিষ্ঠ ব্রহ্মসমূহ অর্থাৎ স্তোত্রসমূহ উচ্চারণ করেছিলেন (ব্রহ্মাণি উৎ ঐরয়ত)। উক্ত পর্বের ৩৮৮ নং মন্ত্রে ইন্দ্রকে ব্রহ্মকৃৎ বলা হয়েছে এবং ৩৯০ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে, —'হে মিত্রগণ, বজ্রধারীকেই ব্রহ্ম বলে স্তুতি করব।' আর একটি মন্ত্র মরুদ্গনকে সম্বোধন করে বলেছেন—' 'তোমরা বৃহৎ ইন্দ্রের জন্য ব্রহ্ম অর্চনা কর,' অর্থাৎ স্তোত্রসমূহ দ্বারা অর্চনা কর (প্র ব ইন্দ্রায় মরুতো ব্রহ্মর্চিত,-সা-২৫৭)। একথাও একাধিকবার জানানো হয়েছে যে ইন্দ্র ব্রহ্মদ্বেষ্টাদের (অর্থাৎ দেবজাতীয়দের যাঁরা দ্বেষ করতেন) হনন করতেন।

দেবতা ও দেবজাতীয় ব্যক্তিরা যখন জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হতেন তখন তাঁদের ব্রহ্মচারী বলা হত। এই দেবজাতীয় ব্রহ্মচারিগণ সমিধ আহরণ করতেন, কৃষ্ণচর্ম পরিধান করতেন এবং দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ করতেন (অ ১১।৫।৬)।

পুরুষ এবং ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁদের অপর একটি চিন্তা ছিল, সেটি দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণ সম্বন্ধে। দেহের সমূহ শক্তির উৎস এই প্রাণসত্তা কি বস্তু সে সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান করতে করতে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাণ শুধু তাঁদের দেহটুকুকে ঘিরেই নয় সর্বত্র সঞ্চরমান। বস্তুতঃ বিশ্বের সর্বত্র প্রতিনিয়ত প্রাণশক্তি স্পন্দিত হচ্ছে যার ফলে শুধু মানুষই নয়, যাবতীয় প্রাণী, উদ্ভিদ্, মৃত্তিকা, জল, তাবৎ পদার্থ এবং বিশ্বপ্রকৃতি আপনা থেকেই বর্ধিত হচ্ছে এবং অপর সকলের অস্তিত্বের নিয়ামক হচ্ছে। অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডের চতুর্থ সূক্তে প্রাণ সম্বন্ধে যে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে তার সারাংশ উদ্ধৃত করছি (অ ১১।৪)।

যে প্রাণ সবকিছুকে আবৃত করে রয়েছেন তাঁকে নমস্কার করি। এই প্রাণই উপযুক্ত ঋতুর আগমনে ওষধীসমূহকে (তথা উদ্ভিদ্‌সমূহকে) আহ্বান জানান

এবং ভূমির উপরে যা কিছু আছে তা আনন্দযুক্ত হয়। এই পৃথিবীতে এবং মহীতলে যখন প্রাণধারা বর্ষিত হয় তখন পশুগণ নূতন শক্তিতে হৃষ্ট ও সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। পিতা যেমন প্রিয় পুত্রকে আবরণ প্রদান করেন প্রাণও সেভাবে প্রজাসমূহকে আবৃত করেন। জীবিত বা জীবনরহিত সকলেরই ঈশ্বর হচ্ছেন এই প্রাণ। মৃত্যুও প্রাণ, আবার গতিশীল অস্তিত্বও (তক্মা) প্রাণ। দেবগণ এই প্রাণকেই উপাসনা করেন। প্রাণই সত্যবাদী এবং ব্যক্তিদের উত্তমলোকে উত্তরণ করছেন। প্রাণই বিরাট, প্রাণই পথপ্রদর্শক, প্রাণই সকলের উপাস্য। প্রাণই সূর্য, প্রাণই চন্দ্রমা, প্রাণই প্রজাপতি। ধান্য, যব, কৃষিকর্মে নিযুক্ত বলদ, এমন কি গর্ভস্থ ভ্রূণও বায়ুর সাহায্যে অথবা নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহযোগে প্রাণ ধারণ করছে। ভূত এবং ভব্য —সবই প্রাণে ব্যবস্থিত। অথর্বণ, অঙ্গিরস প্রভৃতি পিতৃগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ ও ওষধিসমূহ ততকালই জীবিত থাকতে পারে যতকাল প্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। এই পৃথিবীতে বা মহীতলে যখন প্রাণধারা বর্ষিত হয় তখনই ওষধিসমূহ এবং লতাপাতা সঞ্জাত হতে পারে। যিনি এই প্রাণের তত্ত্ব জানেন এবং কিসে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছেন—তা বিদিত আছেন, তাঁকেই উত্তম দেবলোকে অবস্থিত সকলে ঐশ্বর্যপূর্ণ করে তোলেন। যেহেতু, হে প্রাণ এই সমস্ত প্রাণী তোমারই শাসনাধীন, সেহেতু তারা তোমাকেই বলি প্রদান করবে এবং তোমাদ্বারাই শাসিত হবে। এই প্রাণ দেবতাদের গর্ভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তিনি অদৃশ্য থাকেন এবং জন্মগ্রহণ করে দৃশ্যমান হন। তিনিই ভূত, তিনিই বর্তমান এবং তিনিই ভবিষ্যৎ। তিনি পিতা থেকে স্বীয় বীর্যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাণরূপ হংস সলিল থেকে তাঁর একটি পদ উত্থিত করলেও অপরটি উত্তোলিত করেন না। তিনি যদি সেটি উঠিয়ে নিতেন তাহলে আর কদাচ অদ্য বা আগামী দিন উদিত হত না। সমান পরিধিযুক্ত আটটি চক্র (যেমন—রথকে উপরিভাগে রেখে) বর্তিত হয়, তেমনি এই প্রাণ (দেহকে নিজের উপর স্থাপন করে) বর্তিত হয়ে চলেছেন। তাঁর সহস্রচক্ষু সম্মুখে এবং পশ্চাতে প্রসারিত; তাঁর অর্ধব্যাপ্তিই এই বিশ্বভুবনের পক্ষে যথেষ্ট, অপর অর্ধ কতটা ব্যাপ্ত করতে পারে তা নির্ধারণ করা যায় না। ইনিই বিশ্বজন্মের হেতু এবং সমগ্র বিশ্বের সমস্ত চেষ্টা এঁরই মধ্যে নিহিত

আছে। অন্য যারা নিশ্চেষ্ট তাদের কাছে প্রাণ ক্ষিপ্রধন্বার ন্যায় বিনষ্টকারী। ইনি সাধারণভাবে সকলের জন্মের হেতু এবং সবাইকার প্রচেষ্টাই এঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মন্ত্রদ্বারা (ব্রহ্মণা) প্রার্থিত, সদাজাগ্রত বীর এই প্রাণ আমাদের রক্ষা করুন। সুপ্তজনের মাঝখানে এই প্রাণ ঊর্ধ্বভাবে জাগ্রত থাকেন, তিনি কখনও তির্যগ্‌ভাবে অবলম্বন করেন না। হে প্রাণ, তুমি আমার কাছ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হোয়ো না, তুমি আমাকে ছাড়া অপরকে অবলম্বন কোরো না। জলসমূহ যেমন তাব অন্তর্ভাগে অনেক কিছু সমাবৃত রাখে, তেমনি তুমি আমাকে বিধৃত করে রাখ।

এই সমস্ত সূক্তের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে—এই চরাচর প্রাণশক্তিতেই শক্তিমান, প্রাণসত্তা রয়েছে বলেই আমরা সব কিছুতেই একটা চিত্তাকর্ষক আভাস অনুভব করি। জড়পদার্থ বা স্থাবর বস্তুও প্রাণবান, কেন না সেখানেও উদ্ভিদ্ জন্মগ্রহণ করছে অথবা প্রকৃতি ঋতুর পর ঋতুতে তার ছাপ রেখে যাচ্ছে। এমন কি মৃত্যুকেও প্রাণ বলা হয়েছে, কেন না মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যু প্রাণপ্রবাহকে রোধ করতে পারে না। অতএব, দেবতাদের প্রচেষ্টা ছিল প্রাণশক্তি যাতে সর্ব অবস্থাতেই উদ্দীপিত থাকে সেই চেষ্টা করা। প্রাণ হচ্ছে তাঁদের কাছে জীবনীশক্তি যাকে life force বলা যায়।

দেবতাদের দার্শনিক চিন্তা তিনটি বিষয়কে অধিকার করেছিল—একটি পুরুষকার অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বা humanity, অপরটি ব্রহ্ম বা wisdom এবং তৃতীয়টি প্রাণশক্তি বা life force। এই তিনটি চিন্তাই অনেকের অন্তরে এই প্রশ্ন তুলেছিল, —কে আমাদের উপাস্য; কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। দেবতারাও যাঁকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে দেবতা বলেই জানতেন। তাঁদের কাছে পুরুষ, ব্রহ্ম বা প্রাণ, সবাই দেবতা ভিন্ন আর কোনও সত্তা নয়। অথর্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডে (অথবা ঋগ্বেদে) যে সূক্তটি আছে সেটি এইরূপ—

কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব? তিনিই কি পূজ্য যিনি আত্মিক বল প্রদান করেন, যাঁর আজ্ঞা দেবগণ মান্য করেন, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণিসমূহের ঈশ্বর।

কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব? —যিনি জগতের প্রাণ ও

দৃষ্টিশক্তিকে রক্ষা করেন, স্বীয় মহিমায় যিনি স্বয়ং রাজা, যাঁর ছায়া এবং মৃত্যুও অমৃতস্বরূপ, তিনিই কি আমাদের অভীষ্ট ?

কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? —যিনি পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের শরণস্বরূপ, ভীত ব্যক্তি রোদন করতে করতে যাঁকে আহ্বান করেন, যাঁর ওই বিমানগামী পন্থায় আরোহণ করবার জন্য শক্তির প্রয়োজন, তিনিই কি আমাদের প্রণম্য ?

কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? —যিনি মহিমাদ্বারা বিস্তীর্ণ দ্যুলোক, মহতী পৃথিবী এবং ওই সুবিশাল অন্তরিক্ষ ধারণ করেছেন এবং যাঁর মহিমায় সূর্য চতুর্দিকে বিস্তৃত রয়েছে, তাঁকেই কি আমাদের পূজা করতে হবে ?

কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? —সে কি তিনি, যাঁর মহিমায় বিশ্বে হিমাচলসমূহ অধিষ্ঠিত, যাঁর সমুদ্রে এই রসা নামক নদী পতিত হচ্ছে বলে শ্রুত হয়, যাঁর বাহু এইসকল দিক।

কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? —তিনিই কি সেই পূজ্যজন, যিনি সত্যজ্ঞ এবং অমৃত, যিনি নিজের মধ্যে জলসমূহ ধারণ করেন, যিনি অগ্রে বিশ্বকে পরিচালিত করেছিলেন, যেখানে দেবীগণকে দেবগণ রক্ষা করতেন।

কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? —সেই ইষ্টজনই কি আমাদের অর্চনীয় যিনি অগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে সমাবর্তিত হতেন, যিনি ভূতসমূহের একমাত্র পতি ছিলেন, যিনি পৃথিবী এবং দ্যুলোককে ধারণ করতেন।

কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? —তিনিই কি সেই মহত্তম সত্তা যিনি অগ্রে বৎসসমূহের জন্মদান করেছিলেন, যিনি গর্ভে জলসমূহকে প্রেরণ করেন, যিনি জায়মানের স্রষ্টা এবং যিনি জ্যোতিঃসমন্বিত হিরণ্যসমূহ ধারণ করেন।

এই প্রশ্নোত্তরেও দেখা যাচ্ছে বিশ্বের তাবৎ বস্তুকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং সবকিছুই যে একটা প্রাণশক্তিতে বিধৃত ও পরিচালিত তাও উপলব্ধি করা হয়েছে। এই বিরাট আত্মিক বল, মহিমা, সহায়বোধ, সত্যানুসন্ধানী মনোভাব এবং পরম সত্তার বিবর্তন—এ-সবের সূত্রেই যাকে স্বীকার করা হয়েছে সে হচ্ছে প্রাণ, যার অর্চনা করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রয়াস।

দেবতারা এই জগৎ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক তত্ত্বাদি নির্ধারণের চেষ্টারও ত্রুটি রাখেন নি। অথর্ববেদেরই একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে প্রাচীন কালে এই ভূমি

(সভ্যতা) কিরূপ ছিল। সে সম্বন্ধে যাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁরাই ছিলেন পুরাণবিৎ। কেবলমাত্র বর্তমানকে নিয়েই দেবসভ্যতার আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল না। তাঁরা জানতেন তাঁদেরও পূর্বে অপরাপর জাতি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের জানবার চেষ্টাতেও দেবগণ নিযুক্ত ছিলেন।

এই সমস্ত বিষয় নিয়েই দেবব্রহ্মচারিগণ অনুশীলন করতেন। যাঁরা এ সবের চর্চা করতেন তাঁদেরই অপর আখ্যা ছিল ব্রাত্য। ব্রাত শব্দ থেকেই ব্রাত্য শব্দটি নির্ণয় করা হয়েছে। ব্রাত অর্থে সমূহ, সমাজ, সঙ্ঘ বা জনতা বোঝাতো। এঁদের যিনি হিতকারী তাঁকেই ব্রাত্য বলা হত। যিনি ব্রতাদির জন্য সমর্পিত, ব্রতাচারধর্মে তৎপর এবং এতদুদ্দেশ্যে পরিব্রাজকরূপে দেশ-দেশান্তরে পর্যটন করতেন তিনিই ব্রাত্য বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বহু পরবর্তী কালে স্মৃতি-সাহিত্যে ব্রাত্য শব্দ অধম ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হয়ে এসেছে। বৈদিক প্রয়োগে ব্রাত্য শব্দ উত্তম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে জনকল্যাণকারী বোঝায়। অপরপক্ষে, স্মৃতিতে ব্রাত্য অর্থে বেদ-মর্যাদা উল্লঙ্ঘনকারীকে বোঝায়। বৈদিক এবং স্মৃতিগত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে পরিগণিত হয়েছে। প্রজাপতিকে ব্রাত্য বা সকলের স্বামী বলা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের পরিশেষে যজ্ঞ সম্বন্ধে একটু উল্লেখ আবশ্যক। যজন-ক্রিয়াটি আদিতে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে সকলে মিলে আহারাদি ও পশুহনন দ্বারা মাংসভোজনে আপ্যায়িত হতেন। আদিতে দেবগণ যজ্ঞ করে কেবলমাত্র নিজেদেরই পরিতুষ্ট করতেন না, সম্মানিত অতিথিরূপে ইন্দ্রকে ও বৃহস্পতিকে সোমরস প্রদান করতেন। যেহেতু এটি দেবগণের বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল সেহেতু পরবর্তী কালে এটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিগণিত হয় এবং এর প্রভূত বিস্তার ঘটে। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়েও কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

অগ্নি-সোম-ওষধি

অগ্নি

সামবেদ সংহিতার আগ্নেয় কাণ্ড অনুসারে জানা যায় ঋষি গোপবন এবং অঙ্গিরা অগ্নি প্রজ্বলনের কৌশল উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এও বলা হয়েছে যে দেবতারাই অগ্নিকে মনুষ্যের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেন। শুধু দেবতারাই নন অসুরগণও অগ্নির ব্যবহার বিদিত ছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত দুই ঋষি হিমাচলের স্বর্গদেশ থেকে কৌশলটি শিক্ষা করেছিলেন। একটি অরণি কাষ্ঠের ভিতর আর একটি কাষ্ঠখণ্ড প্রবেশ করিয়ে দু দিক থেকে সজোরে ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন করা হত। একেই বলা হত অগ্নিমন্থন। অরণি শব্দটি থেকেই অরণ্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে অগ্নি অরণ্যকেই কামনা করেন। সামসংহিতায় অরণিদ্বয়কেই অগ্নির মাতা বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে অগ্নি স্তন্যপান ছাড়াই বর্ধিত হন।

অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখা হত হবিঃ প্রদান করে। প্রজ্বলন কাষ্ঠগুলিকে বলা হত সমিধ্। অগ্নিকে সব সময় সমিধ্ প্রদান করে গৃহে প্রজ্বলিত রাখা হত। এই কারণে অগ্নিকে বলা হত গৃহপতি। উষাকালে বিশেষ করে অগ্নিকে পূজা করা হত। অনেক সময় সূর্যের সঙ্গে অগ্নির তুলনা করা হয়েছে; কারণ দুজনেই অনেকাংশে সমধর্মী। অগ্নিকে 'পূষণ' আখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

অগ্নিকে আয়ত্তে আনার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা ও মানুষদের পক্ষে বহু দুঃসাধ্য কার্য সহজ হয়ে গেল। যে পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুরতিক্রম্য ছিল, অগ্নির আলোকে সে পথ সুগম করা সম্ভব হল। অবাঞ্ছিত বৃক্ষাদি দগ্ধ করে ফেলা সহজ হল। এইসব কারণে অগ্নিকে মার্গপ্রদর্শক বলা হয়েছে।

অগ্নিদ্বারা পরিপক্ক অন্ন প্রস্তুত করা হতে লাগল এবং নানা খাদ্যও অল্প সময়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হল। এতে মনুষ্য পশু উভয়েই বলসম্পন্ন হয়ে উঠল।

অগ্নির ব্যবহারে কৃষিকর্মের উপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত হতে লাগল। এতে কৃষির উন্নতি হল। এ ছাড়া অগ্নির ব্যবহারে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করাও সম্ভব হল। অগ্নির ভয়ে রাক্ষস, যাতু প্রভৃতি হিংস্র সম্প্রদায় মানবদের কাছে ঘেঁসতে সাহস

করত না। শুধু তাই নয়, আত্মরক্ষার দিক দিয়েও অগ্নি অতিশয় সহায়ক ছিল এবং আজও আছে। অসামাজিক ব্যক্তিবর্গ বা অপহারকগণ রাত্রিকালে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকার দরুণ অসৎ কর্ম করতে সাহসী হত না। অপরদিকে অগ্নিকে নানান সুকুমার কলাতেও প্রয়োগ করা হতে লাগল এবং বিবিধ স্বর্ণ ও ধাতব অলঙ্কার প্রস্তুত করা সহজ হয়ে উঠল।

অগ্নি যেসব কেন্দ্রে প্রজ্বলিত থাকত সেখানেই সৎমনুষ্যগণ বসবাস করতেন। এইজন্য অগ্নিকে বসতি-প্রদানকারী বলা হয়েছে। অগ্নির আর এক নাম সৎপতি। অগ্নিদ্বারা শুচিতা রক্ষা করা সম্ভব হত এবং বহু অপবিত্র বস্তু অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করে বাসভূমিকে পবিত্র করা হত। অগ্নির উত্তাপে বহু রোগ নাশ করা সম্ভব হয়েছিল এবং শীত ও ঋতুর অন্যান্য প্রকোপ থেকে অগ্নির সহায়তায় সুখকর উষ্ণতা লাভ করা সম্ভব হত।

অগ্নি সম্ভূত হওয়া মাত্র সবই পরিষ্কারভাবে জানা যেত। এই কারণে অগ্নিকে জাতবেদা বলা হয়েছে। অগ্নির কৃপায় রাত্রে অধ্যয়নও সম্ভব হত। এই কারণেই হয়ত অগ্নিকে জ্ঞানী বলা হয়েছে। দেবগণ বিশেষভাবে আত্মরক্ষার জন্যই অগ্নির ব্যবহার করতেন বলে তাকে অহিংস বলা হয়েছে। আবার, অগ্নিদ্বারাই সৎ ও অসৎ বস্তু জানা যেত এবং অগ্নিই সত্য পথ চিনিয়ে দিত বলে এর অপর নাম দেওয়া হয়েছিল সত্যধর্মা।

অগ্নিকে অতিথির মত আদরণীয় বলা হয়েছে। অগ্নি, রুদ্রতেজসম্পন্ন, অথচ সুন্দর। অগ্নির বহু গুণের জন্যই তাকে বলা হয়েছে প্রজাপালক। অগ্নিকে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং বিশ্বদূত আখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

সোম

সোম এক প্রকার লতা জাতীয় উদ্ভিদ যা দিব্যলোকের উচ্চ স্থলে জাত হত। এর জন্মস্থান সম্পর্কে মৌজবান পর্বতের বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। সোম প্রথমে মর্ত্যে পাওয়া যেত না, সেই কারণে একে অমর্ত্য বলা হয়েছে। এই অমর্ত্য শব্দটিই সম্ভবতঃ মুখে মুখে অমৃত শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং কালক্রমে একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হতে থাকে।

সোমলতার গুণ নির্ধারণ সম্পর্কে প্রথমে গন্ধর্বগণই অগ্রণী হন। তাঁরাই অগ্নিকে সোম দ্বারা উপাসনা করেন। গন্ধর্ব বিশ্বাবসু সোমের গুণাবলী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হন। গন্ধর্ব বসুরুচি সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কালে সোমের বিশেষ পরিচর্যা করতেন (ঋ ৯।১১০।৬)। সোমের সঙ্গে গন্ধর্ব এবং অগ্নির প্রায়ই উল্লেখ দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াও সোম জলেও বর্ধিত হ'ত। অথর্ববেদে বলা হয়েছে রাজা বরুণ জল থেকে সোমকে আহ্বান করেছিলেন এবং সোম তাঁদের পর্বত থেকে আহ্বান জানিয়েছিলেন (অ ৩।৩)। এতে বোঝা যায় পার্বত্য অঞ্চলে হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ে সোম জাত ও পরিববর্ধিত হত। জলের সঙ্গে অগ্নি এবং সোমের একটা সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। জল বাষ্পাকারে বারি বর্ষণ করে এবং সোম জল দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অথর্ববেদ এই তথ্যটি জানিয়েছেন তৃতীয় কাণ্ডের ত্রয়োদশ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে।

সোমকে ইন্দু বলা হয়েছে। এতে মনে হয় চন্দ্রালোকিত রাত্রেই সোমলতার শ্রীবৃদ্ধি হত। সোমলতার ত্বক জীর্ণ হয়ে গেলে সাপের খোলসের মত সেটি স্খলিত হয়ে যেত এবং নূতন গাত্র দেখা দিত (অহিঃ ন জীর্ণো ত্বচং অতি সর্পতি —ঋ ৯।৮৬।৪৪)। সোমলতা আহরণ করে একটি প্রস্তরের উপর রাখা হত। একে বলা হত গ্রাবপ্রস্তর। রক্ষিত সোমকে আর একটি প্রস্তরখণ্ড দিয়ে মথিত করা হত। কোনও কোনও সময় গোচর্মের উপরে সোমলতা রেখেও তাকে প্রস্তর দিয়ে ছিন্নভিন্ন করা হত। তবে গোচর্মটি যাতে ছিঁড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হত। সেই মথিত সোম জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে ভেড়ার লোমের ছাঁকনিতে রেখে পরিস্রুত করা হত। ছাঁকনিটি মেষ লোম দিয়ে বোনা হত যাতে সেটি বেশ শক্ত এবং মজবুত হত। এই বৃহৎ ছাঁকনিটি দুদিকে দুপক্ষ লম্বালম্বিভাবে টেনে ধরে রাখতেন এবং মধ্যস্থলের জলমিশ্রিত অপরিষ্কার সোমরসকে আঙুল দিয়ে চালনা করে ছাঁকা হত। যাঁরা চালনা করতেন তাঁদের অঙ্গুলীতে প্রায়ই সোনার আংটি থাকত (হেমনা পূয়মানঃ দেবঃ রসং দেবেভিঃ সম্পৃক্ত—ঋ ৯।৯৭।১)। এইভাবে ছাঁকার ফলে অপরিস্রুত বস্তুগুলি ছাঁকনিতে থেকে যেত এবং পরিস্রুত রসটি কলসে গিয়ে পড়ত। একসঙ্গে যখন বহু পাত্রে সোমরস ছাঁকা হত তখন একটি ধারাপাতনের গর্জনধ্বনি জাগ্রত হত। যে বস্তুগুলি ছাঁকনিতে থেকে যেত সেগুলি আরও দুবার জল দিয়ে নিঙড়ে সোমনির্যাস বের করা হত। এইভাবে

প্রতিদিন তিনবার পর্যন্ত সোমরস আহরণ করা চলত। গৃহস্থবাড়িতে অল্প পরিমাণে সোমরস প্রস্তুতের সময় মন্ত্রগান করা হত এবং বাণ নামক এক প্রকার বীণাও বাজানো হত ; এতদ্ব্যতীত ঋষিদের সপ্তবাণীও পাঠ করা হত।

সোমকে পার্বত্য অঞ্চল থেকে যজ্ঞস্থলে অতি সমারোহে নিয়ে যাওয়া হত। যজ্ঞস্থলে সোমকে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত স্থানে বসানো হত বলে তাকে 'রাজা' বলা হত।

সোমরস ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হত এবং অন্ধকারেও চক্ চক্ করত। সোমরস প্রস্তুত হবার পর তাতে দুগ্ধ, মধু, দধি প্রভৃতি তৃপ্তিকর দ্রব্যাদি মিশ্রিত করা হত। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—'পরম ব্যোমে যে সোম অবস্থিত তাতে দুগ্ধ মিশ্রিত করবার জন্য একুশটি ধেনু দুগ্ধ প্রদান করছে (ঋ ৯।৭০।১)।' গাভীগণও সোমরস পান করত। সোমরস গাঢ় করে পুরোডাশ বা অন্নের সঙ্গেও খাওয়া হত। অন্নমিশ্রিত সোমকে 'অন্ধ' বা 'অন্ধস্' বলা হত। যবের আটা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে তার সঙ্গে সোমরস গ্রহণ করা হত। কখনও কখনও ভাজা যব (ধানা), দধিমিশ্রিত ছাতু (করম্ভী) এবং পিষ্টক (অপূপ) সোমরসের সঙ্গে সেব্য হত।

সোমরস অত্যন্ত উৎসাহ এবং আনন্দ প্রদান করত। এই কারণে একে 'মদ' বলা হত। কিন্তু সুরা বলতে আমরা যে প্রকার মদ্য বুঝি সোম সেই পর্যায়ের ছিল না। সোমরসের কিঞ্চিৎ মাদকতা থাকলেও এর থেকে কোনও তামসিক প্রবৃত্তির উদয় হত না। সোমকে অত্যন্ত পবিত্র দ্রব্য বলে জ্ঞান করা হত। এই কারণেই একে 'পবমান' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সোমকে কবিক্রতু (বুদ্ধি বা জ্ঞানবর্ধক), বিপ্র, ধীর, পুরুমেধা, বিপশ্চিৎ, মনীষী, বৃষা প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে এবং 'সত্য' আখ্যাও প্রদান করা হয়েছে (ঋ ৪।৩১।২)। এ ছাড়া সোমকে রত্নদাতা বা ধনদাতা বলা হয়েছে। সোমই ছিল দেবতাদের শক্তির একটি প্রধান উৎস যার ফলে নানারূপ দুষ্কর কার্যে ব্রতী হয়ে তাঁরা রত্ন এবং ধনলাভে সমর্থ হতেন। দেবতাগণ যখন যুদ্ধযাত্রা করতেন তখন তাঁরা প্রচুর সোমরস সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ঋগ্বেদ বলছেন—'হে পরিস্রুত সোম, তুমি মহান আর্য রাজ্যে সকলকে আনন্দ প্রদান কর, তুমি পবমান এবং তুমি কার্যে রত হবার মত বিশেষ শক্তি সঞ্চার কর (ঋ ৯।১১০।২)।'

সোম ও সুরার মিশ্রণ যে ঘটত না, এমন নয়। যজুর্বেদে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—'হে দেব, উজ্জ্বলতা ও আনন্দবর্ধনের জন্য সুরার সহিত সোম মিশ্রিত

হোক।' কিন্তু ইন্দ্র একদা সুরামিশ্রিত সোম পান করে ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে সুস্থ করতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল।

সোমরস বহু পূর্বেই দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ মহাভারত যখন রচিত হয় তখনই সোমের অবলুপ্তি ঘটেছিল; কারণ এই পুরাণ থেকে সোম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায় না বললেই চলে।

ওষধি

স্বর্গ ও মর্ত্য উভয় লোক মিলিয়ে প্রধান প্রধান কয়েকটি রোগ ও সেগুলির ওষধি সম্বন্ধে বেদের সংহিতাভাগ কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদে। অনেকে হয়ত বলবেন অথর্ববেদ অনেক পরবর্তী কালের রচনা এবং এই সংহিতার উল্লেখ প্রাচীনতম ঐতিহ্যের নির্দেশক হতে পারে না। এই অনুমান কিন্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় না। যেহেতু অথর্ববেদ দেবগণের ঘরোয়া জীবনের বিবরণ প্রদান করেছেন এবং সেই সঙ্গে মর্ত্যবাসীদের জীবনবিধিরও প্রভূত উল্লেখ করেছেন এই কারণেই এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই। ঋগ্বেদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অথর্ববেদ বহু পরিমাণে সমসাময়িক, কেন না বহু ঘটনাই ঋগ্বেদীয় পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতর বলে বিবেচিত হতে পারে না। এই সমস্ত ধারণার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অনুমান। ঋগ্বেদের মধ্যেও এমন কিছু প্রক্ষেপ দেখা যায় যা বহু পরবর্তীকালের সংযোজন বলে গণ্য হতে পারে। পাশ্চাত্ত্য মতে অথর্ববেদে নানারকম অলৌকিক মতবাদে বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু লৌকিক বস্তুসমূহের প্রভূত উল্লেখ বা বর্ণনা সম্বন্ধে তাঁরা তেমন সরব নন। অথর্ববেদ সম্বন্ধে এবম্বিধ ধারণা সুবিচারের পরিচায়ক নয়। এই বেদে কতিপয় কবচ, তাবিজ প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে বটে কিন্তু এগুলি আসলে বর্ম বা প্রতিরোধক যুদ্ধোপকরণ। এ সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এগুলির কোনটাই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার প্রতীক নয়। বরঞ্চ এরকম বিশ্বাস যদি কোথাও থেকে থাকে সেটা ছিল সুপ্রাচীন মিশরে, আর্যভূমিতে এরকম চিন্তার বিশেষ অবকাশ ছিল বলে মনে হয় না; কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে দেবতাগণ

পুরুষকারে বিশ্বাস করতেন, কোনও অপ্রাকৃত বস্তুতে নয়। আদিবাসীদের মধ্যে এরকম বিশ্বাস আছে, কিন্তু দেবতাগণ সেই ধরনের বন্য জাতি ছিলেন না, ঋগ্বেদ তাঁদের যথেষ্ট প্রগতিশীল সভ্যতার সাক্ষ্যই বহন করে। অথর্ববেদ কোনও মন্ত্রেই তুকতাকের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করাতে চান নি, অন্যান্য সংহিতার মত এই বেদ সংহিতাতেও ইচ্ছাপ্রণোদিত প্রার্থনাসমূহ সঙ্কলিত হয়েছে। একমাত্র অথর্ববেদ থেকেই স্বর্গ ও মর্ত্যের সমকালীন বসবাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। ঋগ্বেদে যেসব মন্ত্র সঙ্কলিত হয়েছে তা প্রধানতঃ বৃত্র-সংহারক ইন্দ্রকে কেন্দ্র করে। ইন্দ্র যখন স্বর্গলোকের অধিকর্তা তখন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সম্বন্ধ বেশ খানিকটা ঘনীভূত হয়ে এসেছে। ইন্দ্র দেবসভ্যতার আদিতে জন্মগ্রহণ করেন নি, শেষের দিকে তাঁর অভ্যুদয়; কারণ ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই বেদেরও অবলোপ ঘটেছে। ইন্দ্রের বহু শতাব্দী পূর্বে দেবসভ্যতা কি ধরনের ছিল সে সম্বন্ধে ধারণা করবার মত উপকরণ আমরা আজও কিছুই পাই নি। বেদ যে আদিতে কিভাবে রক্ষিত ছিল তা আমরা কিছুই জানি না। একদা ঋক, যজু, অথর্ব—সবই একত্রিত ছিল। যুগে যুগে প্রয়োজনবোধে মন্ত্রগুলিকে সূক্ত হিসাবে সাজানো হয়। কতবার কতভাবে যে এরকম হয়েছে তা কে বলবে? অতএব একটি বিশেষ সূক্তে বিশেষ অর্থে যে মন্ত্রটিকে ব্যবহার করা হয়েছে আদিতে তার উদ্দেশ্য যে একই ছিল এমন কথাও বলা যাবে না। অনেক সময় অনেক ঋষিকে অনেক মন্ত্রের রচয়িতা বলা হয়েছে, কিন্তু তার বিশেষ উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এত হাজার বৎসর পরে বেদের কাল সম্বন্ধে এভাবে ফতোয়া জারি না করাই বিজ্ঞজনোচিত কার্য। অথর্ববেদ একটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও সুপ্রাচীন সংহিতা যাকে লঘু করে দেখার কোনও তাৎপর্য নেই। বরঞ্চ, বহু ঐতিহ্যের সূত্র এই অথর্বসংহিতা থেকেই পাওয়া সম্ভব।

যাক, বর্তমানে ওষধির প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। সোমকে অবশ্য সকল ওষধির শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। দেবতাগণ সোমকে সকল ওষধির শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এবং এর গুণ সম্বন্ধে তাঁরা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন। অনেক সময় ওষধি শব্দে শুধু সোমকেই বোঝানো হয়েছে।

দেবলোক এবং মর্ত্যে পরিব্যাপ্ত কয়েকটি বিশেষ ব্যাধির উল্লেখ বৈদিক সংহিতায় করা হয়েছে। এইগুলি হল, কামিল (কামল), হরিমা (পাণ্ডু বা

ন্যাবা), তক্ম্য (জ্বর), আর্জুনী বা কিলাস (শ্বেতকুষ্ঠ), ক্ষেত্রিয় (যে ব্যাধি পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়), যক্ষ্মা, বিলোহিত যক্ষ্মা, বিষ্কন্ধ (বাত), বলাস (একরকম যক্ষ্মা), কুষ্ঠ, গণ্ডমালা, শীর্ষক্তি (মাথাধরা), কর্ণমূল, উদরযন্ত্রণা বিষূচী, অলজী, পৃষ্ঠ্যা ইত্যাদি।

এই রোগসমূহের মধ্যে যক্ষ্মারোগই সর্বাপেক্ষা চিন্তার কারণ ছিল। হিমবৎ নামক পর্বতশ্রেণীর ত্রিককুদ নামক অঞ্চলের পর্বতগাত্র থেকে একপ্রকার অঞ্জন বা মলম তৈরি করা হত। সম্ভবতঃ শিলা ঘর্ষণ করে এই অঞ্জনের উপাদান সংগ্রহ করা হত অথবা পর্বতগাত্রে কাজলপাড়ার মত একটা কিছু করে, সেই বস্তুটির প্রলেপ দেওয়া হত। এই অঞ্জনপ্রয়োগে জ্বর, বাত, বলাস নামক একপ্রকার যক্ষ্মা প্রশমিত হত। এই অঞ্জনের প্রভাবে না কি সর্পের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যেত। এটিকে একটি উৎকৃষ্ট ভেষজ বলা হয়েছে এবং একে দেবাঞ্জন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এর আখ্যা ছিল যামুন বা ত্রৈককুদ। এই ত্রৈককুদ অঞ্চলটিই সমগ্রভাবে নানাপ্রকার ভেষজের জন্য বিখ্যাত ছিল। অথর্ববেদের একটি সূক্তে বলা হয়েছে যে পর্বতের অক্ষ্য জীবগণকে পরিত্রাণ করে। সম্ভবতঃ অক্ষ্য শব্দে এখানে অক্ষি বা চক্ষু বোঝানো হয়েছে এবং এরকম নির্দেশ করা হয়েছে যে ওষধিবহনকারী পর্বতই ব্যাধি নিরাময়ের দৃষ্টিতে জীবসমূহের সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। হিমবৎ অঞ্চলের উত্তরভাগে গিরিজাত কুষ্ঠনামক একপ্রকার লতা পাওয়া যেত যার বর্ণ ছিল স্বর্ণের মত। তৃতীয় স্বর্গে (প্রদ্যৌঃ বা পিতৃলোক) অশ্বত্থবৃক্ষ সংলগ্ন এই লতাকে আবিষ্কার করা হয়েছিল। উক্ত অঞ্চল থেকে এই লতাকে প্রাচ্যভাগে নিয়ে আসা হয়। উত্তম নামক একপ্রকার কুষ্ঠলতা যক্ষ্মাপ্রতিরোধে বিশেষ সহায়ক ছিল। কুষ্ঠলতাকে বিশ্বভেষজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই লতায় তক্মা বা জ্বরও প্রশমিত হত। যেখানে সোমলতা জন্মাতো সেখানেও এই লতাকে দেখা যেত। বরণ এবং জঙ্গীড় নামক দুটি বনস্পতি থেকে যক্ষ্মার ঔষধ প্রস্তুত করা হত বলে জানা যায়। শিপদ্রু নামক একটি বৃক্ষকেও যক্ষ্মানাশক বলা হত। অরুন্ধতী লতার ব্যবহারেও যক্ষ্মা দূরীভূত হত বলে বিশ্বাস ছিল। বোধ করি এই ভেষজ পুড়িয়ে গুলগুলের সঙ্গে রোগীর ঘরে ধূপের মত ধোঁয়াও দেওয়া হত। যব অর্থাৎ বার্লির জল যক্ষ্মার পক্ষে হিতকারী বিবেচিত হত।

আসুরী বনস্পতি ও শ্যামা নামক লতা কিলাস বা শ্বেতকুষ্ঠের প্রতিষেধক ছিল। শ্বেতকুষ্ঠকে আর্জুনীও বলা হত।

ক্ষেত্রীয় নামক এক শ্রেণীর ব্যাধি ছিল যা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হত। যক্ষ্মাজাতীয় রোগও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শ্রেণীর রোগকে নির্মূল করবার জন্য যে লতা ব্যবহার করা হত তাকে বলা হত 'ক্ষেত্রিয়নাশিনী বীরুৎ'। এর সঙ্গে অর্জুনবৃক্ষের কাণ্ড, যবের পলালি (যব তৃণ) এবং তিলনির্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে।

অথর্ববেদ বলছেন রঘুষ্যৎ হরিণের শীর্ষদেশে ভেষজ বর্তমান—'হরিণস্ত রঘুষ্যদোঽধিশীর্ষানি ভেষজম্'। এই ভেষজ দ্বারা ক্ষেত্রিয়, বিষূচী প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হত। হরিণের শিং চন্দনের মত পাথরে ঘষে কয়েকটি আনুষঙ্গিক পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত করে এখনও ক্ষতের ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর আরও ভেষজগুণ বর্তমান। কামল বা পাণ্ডুরোগের (Jaundice) প্রতিবিধান হিসাবে বোধ করি ত্রৈককুদ অঞ্জন ব্যবহার করা হত।

সেযুগে যুদ্ধবিবাদ লেগেই থাকত। এই কারণে হাড়ভাঙার চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। অরুন্ধতী একপ্রকার রোহণী বা লতা। একে পেষণ করা হত এবং এই পিষ্ট ঔষধকে ভাঙা হাড় স্বস্থানে জুড়ে দেবার কাজে লাগানো হত। এতে শুধু অস্থিসঞ্চারই হত না, মজ্জা, মাংস এবং লোমও বর্ধিত হত। কেটে কুটে গেলে, ছড়ে গেলে, পড়ে গিয়ে আঘাত লাগলে বা প্রস্তরের আঘাতে আহত হলে ঋভুগণ এই ঔষধ প্রয়োগ করতেন। এই ঔষধ যুদ্ধযাত্রাকালে রথে বহন করা হত। এই লতা গোজাতীয় পশুদের পক্ষেও উপকারী ছিল।

বিষাণকা নামক গাছ বাতনাশক হিসাবে গণ্য হত। জঙ্গীড় বৃক্ষও বিষ্কন্ধ এবং সংস্কন্ধ (বাতের ব্যথা) নামক ব্যাধির প্রতিষেধক ছিল।

অপামার্গ নামক উদ্ভিদ্‌কে সমস্ত ওষধির শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে,—'অপামার্গ ওষধীনাং সর্বাসামেক ইৎ।' বহু রোগের প্রতিষেধক হিসাবে এই ঔষধ ব্যবহার করা হত। এই উদ্ভিদটি বহুধা বিস্তৃত হত এবং এতে না কি ফলও হত (অ ৭।৬৫)। পূতদ্রু বা খদির বৃক্ষকেও রোগনাশক বলা হয়েছে। সাধারণভাবে আরও অনেক বৃক্ষ, উদ্ভিদ্ ও লতা রোগনাশক ছিল। এর মধ্যে বিশেষভাবে সিলাচী নামক একটি লতার নাম পাওয়া যায়। এটি অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ এবং খদির বৃক্ষকে অবলম্বন

করে বর্ধিত হত। ধব নামক একপ্রকার গুল্মের সঙ্গেও এটি মিশে থাকত। এটিকেও অরুন্ধতী অর্থাৎ রোহণী বলা হয়েছে। এর বর্ণ ছিল সুবর্ণাভ এবং এর একটি দীপ্তি ছিল। জলে যে সিলাচী বর্ধিত হত তাকে লাক্ষা বলা হয়েছে। অবকা নামক একটি জলজ ওষধি সাধারণভাবে রোগনাশক বলে বিবেচিত হত। মন্থ বা অন্নের মণ্ডও অত্যন্ত উপকারী বলে জানানো হয়েছে। ওষধি হিসাবে তলাস নামক একটি বৃক্ষের উপকারিতা না কি সোমের মতই ছিল।

সেকালে সর্পদংশন একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। সর্পবিষ নিবারণের জন্য তাবুব এবং তস্তুব নামক দুটি বিশেষ ওষধির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবলভাবে নদীজলসিঞ্চন এবং শীপালা নামক একটি জলজ ওষধিও বিষের প্রতিষেধক হিসাবে প্রয়োগ করা হত। বিশুদ্ধ জল শরীরকে দোষমুক্ত করে, এই উপদেশও বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে।

উত্তপ্ত মস্তিষ্কসঞ্জাত ক্রোধ উপশমের জন্য দর্ভ নামক ভূরিমূল এবং জলে বর্ধিত একপ্রকার ঘাসের ব্যবহারের কথা জানা যায়।

কেশবর্ধক হিসাবে কয়েকটি ওষধির উল্লেখ করা হয়েছে। একপ্রকার সোম কেশের পক্ষে হিতকারী ছিল। এই সোম পৃথিবীতে জাত হত। শমী নামক শত শাখায় বিস্তৃত বৃক্ষ কেশবর্ধক হিসাবে সহায়ক হত। নিতত্নী নামক একটি লতা কেশবর্ধনের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। এই লতাটি না কি জমদগ্নি তাঁর দুহিতার জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এটি বীতহব্য অসিতের গৃহ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন (অ ৬।১৩৬)।

স্বর্গলোকের বিচিত্র পথ

বিমুচ্যধ্বমঘ্ন্যা দেবযানা অগন্ম
তমসস্পারমস্য জ্যোতিরপাম ॥ —যজুর্বেদ ১২।৭৩

হিংসারহিত দেবযানকে পৃথক করে রাখ, রাত্রির পরে এসো। কারণ, সূর্যের জ্যোতি তখন চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হবে।

দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশই আধ্যাত্মিক, বোধ করি স্পিরিচুয়্যাল বললেই ঠিক হয়। এই দুটি শব্দ যে আমাদের চলাফেরার রাস্তার মতই দেবজাতীয় ব্যক্তিদের ভ্রমণমার্গকে বোঝাতো সেটা স্বীকার করতে যেন অধ্যাত্মবাদীদের বিপুল দ্বিধাবোধ রয়েছে। বেদের সংহিতাভাগ প্রধানতঃ বস্তুনিষ্ঠ। মন্ত্রসমূহের মূল উদ্দেশ্যই হল সগৌরবে বেঁচে থাকার নীতিকে ঘোষণা করা। এই কারণেই বার বার মন্ত্রাদিতে এই প্রার্থনাই করা হয়েছে যে মানুষ (অবশ্যই মর্ত্য ও অমর্ত্য—দুই শ্রেণীর ব্যক্তিসম্প্রদায়) যেন সুস্থ দেহে শতবৎসর বেঁচে থাকতে পারে, সে যেন শত বৎসর ধরেই ঋতুর পর ঋতুর লীলা উপভোগ করতে পারে। কিন্তু বৈদিক উপলব্ধির এই বাস্তব-প্রেক্ষণ খুব কম আলোচনায় পাওয়া যায়।

দে ব তা— একটি বিশেষ নরগোষ্ঠীর প্রতীক, যাঁরা সভ্যতায় সমধিক অগ্রসর ছিলেন। এই কারণেই তাঁরা নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দিতেন। একথা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে দেবজাতীয়েরা হিমালয়ের সহনশীল উচ্চভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং এই বিরাট পার্বত্য অঞ্চলকে বহু শতাব্দী ধরে একাধারে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও পরম রমণীয় করে রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ প্রমাণ-সহকারে তার সামান্যতম ইতিহাস বা নিদর্শন পাবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমাদের ধারণাগুলি অনুমান-নির্ভর এবং আমাদের প্রধানতম সূত্র হচ্ছে বেদমন্ত্র ও বৈদিক সাহিত্য। এছাড়া সত্যভিত্তিক ধারণার আর কোনও পথ নেই।

জীবনধারণের জন্য দেবতারা সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের পার্বত্য বাসভূমিতেই আবদ্ধ ছিলেন না, তাঁরা আরও অনেক নিচে মর্ত্যভূমির সঙ্গেও নিবিড় যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু

হিমাচলস্থিত স্বর্গলোককে তাঁরা এমন সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন যে সেখানে প্রবেশ করাটা অন্যের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। কোনও সভ্য সমাজকে বহির্দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে বেঁচে থাকতে গেলে উত্তম পথঘাট নির্মাণ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। দেবতারাও তাই করেছিলেন। তাঁরাও প্রশস্ত, নাতিপ্রশস্ত এবং অপ্রশস্ত বহু রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন, যেগুলি স্বর্গভূমি থেকে অন্তরীক্ষ অঞ্চল এবং সেখান থেকে মর্ত্যভূমির দ্বারদেশে এসে পৌঁছেছিল। এই প্রসঙ্গে অন্তরীক্ষ বলতে কি বোঝাতো সেটি উপলব্ধি করা দরকার। সাধারণতঃ বর্তমানে অন্তরীক্ষ বলতে আমরা শূন্যস্থল বুঝি; কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে অন্তরীক্ষ (সাধারণতঃ 'অন্তরিক্ষ' বলা হয়েছে) হচ্ছে স্বর্গ এবং মর্ত্যদেশের মাঝামাঝি সুবিস্তৃত উচ্চতর অঞ্চল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির উল্লেখে দেখা যায় এই প্রদেশে কলি-জাতীয় গন্ধর্বেরা বাস করতেন। এছাড়া আরও অনেক জাতির বসতি নিশ্চয়ই ছিল।

বৈদিক উল্লেখ অনুসারে পথ ছিল চারপ্রকার—আপথ ও অভিমুখী পথ, বিপথ বা বিমার্গ, অন্তস্পথ অর্থাৎ পার্বত্য কঠিন প্রদেশ খনন করে রচিত ছিদ্রপথ এবং অনুপথ বা অনুকূলমার্গ। এইগুলির মধ্যে বিপথগুলি ছিল এমন পথ যেখানে শত্রুরা প্রবেশ করলে মরণাপন্ন হত। সমগ্র স্বর্গলোক থেকে বহির্জগতে এই পথগুলি দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল—একটিকে বলা হত দেবযান এবং অপরটিকে বলা হত পিতৃযান। দেবযানগুলি ছিল প্রধানতঃ দেবলোকের তত্ত্বাবধানে আর পিতৃযান ছিল পিতৃলোকের অধিপতি যমের আয়ত্তে। তবে, দেববর্গীয় সমস্ত জাতিই উভয় পথ ব্যবহার করতেন তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে। কোন্ বিশেষ কারণে পিতৃযানগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল তা জানা যায় না, কিন্তু এই পথগুলি পিতৃলোকের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পিতৃলোক ছিল দ্যুলোক বা দেবগণের অধিষ্ঠানভূমি স্বর্গলোকের আরও ঊর্ধ্বে। অথর্ববেদের অষ্টাদশ কাণ্ডের প্রথম সূক্তের শেষ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, আঙ্গিরসগণ যে পথে পরিভ্রমণ করতেন সে পথ দিব্যলোক থেকেও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। উক্ত স্তোত্রেই জানান হয়েছে যে পিতৃগণ বলতে বোঝাতো নবগ্ব, অথর্বন, ভৃগু, সৌম্য এবং আঙ্গিরসগোষ্ঠীর ঋষিগণ এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে। এই রকম উল্লেখও আছে যে সৌম্যগোষ্ঠীর পিতৃগণ পূর্যান অর্থাৎ পুরু বা বিস্তৃত, গম্ভীর পিতৃমার্গসমূহে যাতায়াত করতেন (অথর্ব

৪।৪।৬২-৬৩)। অন্তরীক্ষ প্রদেশের ঠিক উপরেই ছিল স্বর্গলোকের প্রারম্ভ যাকে দ্যৌঃ অর্থাৎ দ্যুলোক বলা হত। তার উপরে অবস্থিত ছিল পীলুমতি নামক স্বর্গাঞ্চল এবং তারও উচ্চপ্রদেশে অবস্থিত ছিল প্রদ্যৌঃ নামক স্বর্গলোক, যেখানে পিতৃগণ বাস করতেন; —তৃতীয়া প্রদ্যৌঃইতি যস্যাং পিতরঃ আসতে (অথর্ব ১৮।২।৪৮)। অতএব, পিতৃলোকের অধিবাসীরাও দেববর্গীয় ছিলেন, যদিচ তাঁরা ছিলেন ঋষিপদবাচ্য মনীষী এবং দেবগণের পিতৃতুল্য।

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৭৬।২ মন্ত্রে বলা হয়েছে—'প্র মে পন্থা দেবযানা'—আমাদের পথ দেবযান। এই পথ সূর্যোদয়ে উদ্ভাসিত হত। সূর্যোদয় থেকে দিবাভাগেই এইসব পথে চলাফেরা করা সম্ভব হত, কারণ অন্ধকারে এই সমস্ত পার্বত্য অরণ্যপথ বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ত। দেবযান বিশেষভাবেই রমণীয় ছিল, তাই সূর্যোদয়ে উক্ত পার্বত্যপথগুলির চতুর্দিক ফলে, ফুলে, লতায়, কুঞ্জবিতানে সুশোভিত থাকত।

অথর্ববেদের নবম কাণ্ডের দশম সূক্তে স্বর্গলোক এবং মর্ত্যলোকের সম্বন্ধ সম্পর্কে একটি মন্তব্য করা হয়েছে। এতে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে অমর্ত্য অর্থাৎ স্বর্গলোক মর্ত্যেরই সহোদর—অমর্ত্যঃ মর্ত্যেনা সযোনিঃ (অ ৯।১০।১৬)। দুটি লোকই স্বীয় শক্তিতে নিচে এবং উর্ধ্বে অবস্থিত এবং তারা শাশ্বতভাবেই বর্তমান। কিন্তু তারা বিরুদ্ধগতিসম্পন্ন; —এই কারণে একে অন্যকে জানলেও অপরে একজনকে জানে না। এর অর্থ এই যে, অমর্ত্যগণ মর্ত্যকে জানলেও মর্ত্যবাসিগণ অমর্ত্য-লোককে জানতেন না। সুতরাং দেবলোকের অধিবাসীরা যত সহজে মর্ত্যে নেমে আসতে পারতেন, মর্ত্যলোকের অধিবাসীরা তত সহজে দেবলোকে যেতে পারতেন না। যাওয়া দূরে থাকুক, পৌঁছোতেও পারতেন কি না সন্দেহ। একাদশ কাণ্ডে বলা হয়েছে, 'হে অগ্নি, তুমি সমান পথসমূহ (অর্থাৎ অবন্ধুর পথসমূহ) চিনিয়ে দাও, আমাদের গমনকার্যে সহায়তা কর এবং সেখানের পথসমূহ কল্পনা করতে দাও। সুকৃতি দ্বারা আমরা গমন করব এবং সূর্যের সপ্তরশ্মিতে উদ্ভাসিত স্বর্গলোকে যজ্ঞ করতে সমর্থ হব (অ ১১।১।৩৬)।

এইখানে যজ্ঞ বলতে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে ঠিক কি বোঝাতো সেটাও উপলব্ধি করা দরকার। অথর্ববেদ এ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। দেবগণ যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞকে অনুষ্ঠিত করেছিলেন এবং এই সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপগুলিই প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানের

পরিচায়ক। এরই জন্য স্বর্গলোক মহিমান্বিত হয়েছিল। পূর্বে যেখানে দেবজাতীয় সাধ্যগণ ছিলেন সেখানেই প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। সেই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল, তা ক্রমেই বর্ধিত হতে লাগল এবং সেটিই দেবগণের আরাধ্য হয়ে উঠল। বলা হয়েছে দেবগণ অমর্ত্যগণের উদ্দেশেই অমর্ত্যমানসে যজন করেছিলেন। এর সরল তাৎপর্য হচ্ছে এই যে যজনক্রিয়াটি অমর্ত্য দেবগণেরই পরিকল্পনা এবং স্বীয় স্বার্থে-ই তাঁরা এই প্রথা মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অথর্বণগণ নিজেরাই বলেছেন—"এই যজ্ঞের ফলে উচ্চস্থল স্বর্গলোকে আমরা আনন্দিত হব এবং সূর্যোদয়ে এই যজ্ঞের ফল ভোগ করব।" দেবগণ পুরুষকারকে জাগ্রত করবার জন্যই হবির্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন এবং তারই ফলে তাঁদের ওজঃশক্তি বৃদ্ধি পেত। একমাত্র হবিপ্রদত্ত যজ্ঞেই এই বল লাভ করা সম্ভব হত। যেসব দেবতা কুকুর, গবাদি পশুর অঙ্গ দিয়ে যজন করতেন তাঁরা মূঢ় বলে গণ্য হতেন। যাঁরা এই যজ্ঞের আসল উদ্দেশ্য অবগত তাঁদেরই অথর্বণগণ এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া উচিত মনে করতেন (অ ৭।৫।১-৫)।

এই উক্তি থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আদিতে যজ্ঞে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না, এটি ছিল একটি সামাজিক অনুষ্ঠান এবং পরবর্তী কালের মত বৃহদায়তন অনুষ্ঠানও এটি ছিল না। দেবতা ও দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অপরজাতীয় নেতাগণ নানা উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মিলিত হতেন। তখন তাঁরা সোমপান ও সমারোহপূর্বক আহারাদি ও বিবিধ উৎসবের আয়োজন করতেন। এই উপলক্ষে উক্ত সম্মেলনের নেতাকে বিশেষভাবে সোমরস প্রদান করা হত মাননীয় অতিথি হিসাবে; কোনও অজ্ঞাত বৃহৎ শক্তিকে নিবেদন করবার জন্য এই আয়োজন করা হত না। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একত্র মিলিত হয়ে পান-ভোজনের মাধ্যমে একটা একতার মনোভাব গড়ে তোলা, যার কল্যাণে নতুন উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার হত। এইটিকে উপেক্ষা করে কেবল পশুর মাংসে উদরপূর্তি করলে বা কুকুর প্রভৃতি শত্রু বিনাশের জন্য উৎসর্গ করলেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। মর্ত্যবাসীরা যখন দেখলেন বিবিধ আহার্য উৎসর্গ করলে শক্তিমান দেবলোকের সহায়তা পাওয়া যায় তখন তাঁরা দেবতাদের আহ্বান করে এইরকম আহার্য ও উপঢৌকন প্রদান করতে লাগলেন। পরবর্তী কালে যেমন সব বিষয়ে হয়েছে তেমনি এই ব্যাপারটিও একটি সুবিস্তৃত পূজার পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

মর্ত্যবাসী এবং অমর্ত্যগণ সকলেই খুব সাবধানে দেবযানগুলিতে ভ্রমণ করতেন। কোন রকম দুষ্কৃতির পরিকল্পনাও এইসব অভিযানে পরিত্যক্ত হত। দীর্ঘকাল ভ্রমণে ক্লান্ত হবার পর যাত্রীরা পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে নতুন উদ্যম লাভ করতেন এবং এর সূচনা হত সকালে সূর্যোদয়ের পরে। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য। অথর্ববেদ সরাসরি ইন্দ্রকে বণিক আখ্যা দিয়েছেন। জনৈক অথর্বণ বলছেন—"পণ্যকাম বণিক্ ইন্দ্রকে আমি উদ্বুদ্ধ করব। তিনি আসুন আমাদের পরিপন্থী শত্রুদের বিতাড়িত করুন, হিংস্র পশুদের দূরে সরিয়ে দিন। তিনি আমাদের শুভকারক এবং ধনদাতা হয়ে বিরাজ করুন। এই দ্যুলোক এবং পৃথিবীর মধ্যে বহু বহু পন্থা প্রসারিত রয়েছে যেগুলি দেবযান বলে পরিজ্ঞাত এবং যেগুলিতে দেবতাগণ পরিভ্রমণ করে থাকেন। তাঁরা আমার সঙ্গে দুগ্ধ এবং ঘৃতে পরিতৃপ্ত হোন, যাতে তাঁদের সহায়তায় আমি ক্রিয়াকর্মে ধন আহরণে সমর্থ হই। হে অগ্নি, তোমারই সাহায্যে আমরা এই দূর সরণি হেঁটে পার হয়ে এসেছি। তোমার আনুকূল্যে আমাদের মঙ্গল হোক, আমাদের ক্রয়বিক্রয় সাফল্যজনক হোক। হে ইন্দ্র এবং অগ্নি, তোমরা দুজনেই এই হব্যসকল গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হও। তোমাদের শুভ প্রভাবে আমাদের এই বাণিজ্য ব্যবহার এবং এর থেকে লব্ধ ধন আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর হোক। যেহেতু ধনের জন্য আমরা গতায়াতে নিযুক্ত আছি এবং দেবগণ ধনদ্বারাই প্রভূত ধন অর্জনের ইচ্ছা করেন সেহেতু, হে অগ্নি আমারও ধনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকুক এবং তা যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়। হে ইন্দ্র এবং অগ্নি, তোমরা আমাদের শত্রুদের যজ্ঞ দ্বারা দূরীভূত কর। হে ইন্দ্র প্রজাপতি, সবিতা, সোম এবং অগ্নি, তোমরা আমাকে দ্যুতিমান কর। হে হোতা অগ্নি, আমরা তোমাকে স্তুতিপূর্বক নমস্কার করি। তুমি আমাদের সন্তানগণকে, পশুগণকে এবং আমাদের জীবনকে রক্ষা কর। অশ্বসদনে যেমন আমরা অশ্বগণের জন্য আহার্য প্রদান করি, তেমনি হে জাতবেদা অগ্নি, তোমার জন্যও আমরা হব্য উৎসর্গ করব। আমরা যেন ধনসম্পদে, পুষ্টিতে সানন্দে বর্ধিত হই। হে অগ্নি, আমরা যেন দুর্ভাগ্যে পতিত না হই (অ ৩।১৫)।"

এই উক্তি অনুসারে দেবযান যে বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হত সেটি অতিশয় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই রকম একটি অনুমানও হয়ে থাকে যে মুদ্রার প্রচলনও সেই অতি প্রাচীন যুগে ছিল। 'ধন' শব্দটি এই স্তোত্রে এমনভাবে

প্রযুক্ত হয়েছে যে মুদ্রা ব্যতীত আর কোনও আদানপ্রদানের মাধ্যম পরিকল্পনা করা যায় না। খুব সম্ভব এই মুদ্রাগুলি প্রধানতঃ ছিল স্বর্ণমুদ্রা, কেন না বেদ-সংহিতায় স্বর্ণ বা হিরণ্যের সুপ্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেবজাতীয় এবং মর্ত্যজাতীয় ব্যক্তিরা উভয়েই এইসব পথে বিবিধ বাণিজ্যপণ্য নিয়ে আসতেন, পথে বিপদ বড় কম ছিল না। দস্যু-তস্কর সে যুগেও ছিল, আর ছিল 'যাতু' নামক হিংস্র নরখাদক আদিম অধিবাসী যাদের স্মৃতি আজও 'ইয়েতি' নামের মধ্যে নিহিত আছে। অগ্নির সাহায্যে এদের বিতাড়িত করা হত। পথ চলতে সেকালে অগ্নিই ছিল সবচেয়ে বড় সহায়। এই পথগুলি সব স্থানেই সূর্যালোকে উদ্ভাসিত থাকত না, বহুস্থানেই নিবিড় বৃক্ষলতায় আলোর প্রবেশ অবরুদ্ধ হত। তা ছাড়া পর্বত খনন করেও এক পথের সঙ্গে আর এক পথকে সংযুক্ত করা হত। এই সব সুড়ঙ্গপথ ছিল ভয়াবহ রকমের অন্ধকার। একমাত্র প্রজ্বলিত মশাল ভিন্ন এই সব পথে ভ্রমণ করা অসম্ভব ছিল। তাই, অগ্নিকে বারম্বার স্তুতি জানানো হয়েছে। আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে ভ্রমণকারিগণ নিজেদের পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে আনতেন, আর সঙ্গে থাকত প্রচুর ভারবাহী গো, অশ্ব এবং পার্বত্য ছাগ। সব মিলিয়ে এসব দল নেহাৎ ক্ষুদ্র হত না। আরও একটি স্তোত্রে এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সেটি এইরূপ — দ্যুলোক এবং পৃথিবীর মধ্যে দেবতাদের যাতায়াতের জন্য বহু পথ বর্তমান ; সেগুলির মধ্যে যে পথটি সমৃদ্ধি প্রদান করে, হে দেবগণ সেই পথে যাবার জন্য আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য কর। গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এবং শিশির—এই সব ঋতু আমাদের উত্তম অবস্থায় রাখুক। পুত্রদের ও গোসমূহের সহিত আমাদের সুখে রক্ষা কর। তোমাদের সঙ্গে আমরা নিরুপদ্রব স্থানে বাস করব। ক্রমশঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের জন্য আমাদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রকাশ কর। যাঁরা আমাদের যজ্ঞ করবার যোগ্য তাঁদের সুমতি ও আনুকূল্য যেন আমরা পাই (অ ৬।৫৫)।

এই নিরাপত্তার আবেদন থেকে অনুমান হয় যে দেবমার্গে বাণিজ্যের অভিযানগুলি সময় সময় তিন বৎসর কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হত। সব ঋতুতেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হত না, বিশেষ করে বর্ষায় এবং শীতে যাত্রীদের বেশ কিছুদিন আটকে পড়তে হত। এইসব অভিযানে গো এবং অশ্বের বিশেষ উল্লেখ থাকলেও

পাহাড়ী ছাগলের ভূমিকাও কম ছিল না। বর্তমান কালের মত সেকালেও বলিষ্ঠ পাহাড়ী ছাগলের পিঠে বোঝা চাপানো হত এবং তাদের নিয়ে পার্বত্য পথে ভ্রমণ করা হত। পথে ছাগমাংস পুড়িয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তিও করা হত দরকার পড়লে। এর উল্লেখ করেই একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—"অজ বা ছাগ অগ্নি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এবং সে তার জনিতা অগ্নিকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই দেখেছিল (অ ৪।১৪।১)।" তার পরেই বলা হয়েছে, দেবগণ তাদের কল্যাণেই দেবত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন।

কিভাবে এইসব পথে যাওয়া হত সেটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে—"স্বর্গের অভিমুখে যাত্রা কর, হাতে থাকুক প্রজ্বলিত মশাল। দিবালোকে স্বর্গে উপস্থিত হয়ে তোমরা দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হও। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে আমি অন্তরীক্ষে আরোহণ করছি এবং দিব্যপৃষ্ঠ থেকে আরও অগ্রসর হয়ে আমি জ্যোতির্ময় লোককে প্রাপ্ত হয়েছি।" কিন্তু এই রকম ধারণা করলে ভুল হবে যে মর্ত্যবাসিগণ স্বর্গলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হতেন। ক্রয়বিক্রয় যা কিছু হত সেটা হত স্বর্গের দ্বারদেশে যেখানে স্বর্গের পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা করা যেত কিন্তু তার অভ্যন্তরের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যেত না।

এই হল সুপ্রাচীন দেবযানের বাস্তব পরিচয়। যাঁরা এইসব দেবমার্গের কল্পনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ত্বষ্টার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিতে স্বর্গলোকে দশজন নায়কস্থানীয় দেবতা ছিলেন। ক্রমে ত্বষ্টা নামক একজন প্রাচীন দেবতা স্বর্গলোক থেকে পথ কেটে মর্ত্যে নেমে আসেন এবং তাঁর বংশধর ও অন্যান্য দেবতারা মর্ত্যে বসতি স্থাপন করতে থাকেন (অ ১১।৮।১৮)। প্রাচীন যুগ থেকেই বহু ব্যক্তি এইরকম চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গক্রমে ত্বষ্টারই উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতৃযানও দেবযানের মতই স্বর্গপথ; কিন্তু এগুলিতে কর্তৃত্ব করতেন পিতৃলোকের অধিবাসিবৃন্দ। তাঁদের সর্বময় কর্তাকে বলা হত যম। দেবগণ ও পিতৃগণের অন্ত্যেষ্টি ব্যবস্থাদি যমের অধীন ছিল, কারণ তিনিই ছিলেন স্বর্গ-রাজ্যের দণ্ডবিধাতা। এই কারণেই তাঁকে মৃত্যু বলা হত। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—"হে মৃত্যু (অর্থাৎ যম), তোমার যে নিজস্ব পন্থা তা দেবযান থেকে ভিন্ন (ঋ ১০।১৮।১)।" পিতৃযানসমূহের সংখ্যা বোধ করি দেবযান অপেক্ষা

বেশিই ছিল এবং বহু গুপ্ত পথ পিতৃযানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কারণ শত্রুর গতিবিধি যমের অধীনস্থ কর্মচারীরাই লক্ষ্য করতেন। দেবগণের বহু গুপ্তচর এইসব পথের উপর দৃষ্টি রাখতেন। এঁদের বলা হত 'স্পর্শ', যার পাশ্চাত্ত্য আখ্যা 'স্পাই'; এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—"ন তিষ্ঠন্তি ন নিমিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পর্শ ইহ যে চরন্তি (অ ১৮।১।৯)।" এখানে দেবগণের যে সব গুপ্তচর অবস্থান করেন তাঁরা চুপ করে বসে নেই বা ঘুমন্তও নেই। অর্থাৎ, তাঁরা সদাজাগ্রত থেকে অপরের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করেন। মহাভারতের বনপর্বে কথিত আছে হনূমান ভীমসেনকে গন্ধমাদন পর্বতে কদলীবনের অন্তরালে অতি সঙ্কীর্ণ স্বর্গরাজ্যের গুপ্তপথে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিলেন। এটি নির্ভরযোগ্য সুপ্রাচীন ঐতিহ্যেরই নিদর্শন এবং কল্পকথা নয়। এইরকম বহু গুপ্তপথেই স্বর্গের প্রহরিগণ শত্রুদের কার্যাবলী লক্ষ্য করতেন এবং বিশেষ উদ্দেশ্যেই দেবলোকের অধিবাসীরাও এই সব পথ ধরে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। আর একটি সূক্তে এইসব পথে দেবজাতীয় অন্তর্ঘাতীদের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, দেবতাদের সঙ্গে যাঁরা শত্রুতা করতেন সেই সব দেবতাকে (দেবপীয়ুঃ) মর্ত্যে মনুষ্যসমাজে বিতাড়িত করা হত এবং যে দেবতা দেববন্ধু ব্রাহ্মণকে হিংসা করত (অর্থাৎ, পিতৃলোকের অধিবাসীদের হিংসা করত) সে পিতৃযানও অনুসন্ধান করে পেত না।

দেবযান এবং পিতৃযান উভয় শ্রেণীর পথেই এমন ব্যক্তিদের ভ্রমণ করতে দেওয়া হত যাদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকত না। বিশেষ করে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের কোনক্রমেই এসব পথে বিচরণ করতে দেওয়া হত না, কেন না ঋণী ব্যক্তিরা বাণিজ্যের পক্ষে নিরাপদ বলে গণ্য হতেন না। এ সম্পর্কে একটি সূক্ত উদ্ধৃত করি।

"আমার আহার্যের জন্য যা দেওয়া প্রয়োজন, যে ঋণ পরিশোধ করা হয় নি এবং যে কর যমকে দিয়ে আমি বিচরণ করি,—হে অগ্নি আমি যেন আগে সেই সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে অঋণী হই। একমাত্র হে অগ্নি, তুমিই জানো সমস্ত বন্ধন থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে বাস করে এখানকার প্রাপ্য আমি চুকিয়ে দিয়ে থাকি। জীবসকল একজন আর একজনকে এখানকার প্রাপ্য পরিশোধ করে থাকে। আহারের পর যেসব ধান্য অবশিষ্ট থাকবে তাই দিয়ে আমরা অঋণী হব। এই ভূলোকে আমরা অঋণী হব, অন্তরীক্ষেও অঋণী হব এবং

তৃতীয় লোক এই দ্যুলোকেও আমরা অঋণী থাকব। দেবযান এবং পিতৃযানসমূহ যেসব লোকের ভিতর দিয়ে চলে গেছে সেই সমস্ত লোকেই আমরা অঋণী অবস্থায় বিচরণ করব (অথর্ব ৬। ১১৭)।”

ভ্রমণকারীরা যথার্থ অঋণী কি না সেটি নির্ণয় করবার জন্য প্রতিটি প্রধান মার্গে স্থানে স্থানে কর্মচারীরা অবস্থান করতেন। এঁরা যমের অধীনস্থ ছিলেন। রাষ্ট্রনিযুক্ত উগ্রশাসকগণ এইসব অঞ্চল শাসন করতেন এবং ঋণীকে রজ্জুবদ্ধ করে যমের কাছে পাঠিয়ে দিতেন (অ ৬।১১৮।২)। বলা বাহুল্য যমের কাছে যাঁদের পাঠানো হত তাঁরা দেবজাতীয় হতেন। মর্ত্যজাতীয়দের আর অগ্রসর না হতে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করা হত। এঁদের যা কিছু শাস্তি তার বিধান করতেন এই কঠোর প্রকৃতির যমানুচরবৃন্দ, যাঁদের ঐতিহ্য থেকেই যমদূত আখ্যাটি প্রচলিত হয়ে এসেছে।

পিতৃযানসমূহে এইসব কর্মচারী এবং গুপ্তচর ছাড়াও পাহারা দেবার জন্য পালিত কুকুরদের নিযুক্ত করা হত। অথর্ববেদে বলা হয়েছে পিতৃলোকে যাত্রার কালে চতুরক্ষ বিচিত্রবর্ণের দুটি রক্ষী সারমেয়কে অতিক্রম করে উত্তমমার্গে পৌঁছোতে হত। তারপর জ্ঞানী পিতৃগণের বাসস্থানে পৌঁছোনো যেত। এই ভ্রাম্যমান বলবান কুকুর দুটির রক্ষাকর্তা ছিলেন স্বয়ং যম। তারা পথে মনুষ্যদের পর্যবেক্ষণে রত থাকত। এদের নাকগুলি লম্বা ধরনের হত (অ ১৮।২।১১-১৩)। আর একটি সূক্ত থেকে অনুমান হয় যে অপ্সরাগণ নানাজাতীয় পালিত কুকুর নিয়ে পথে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। এইসব কুকুর ছিল হিংস্র প্রকৃতির এবং এরা শত্রুদের ভাল করে চিনে নিতে পারত (অ ১১।৯।১৫)। এটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে এই দীর্ঘ পথসমূহে মাত্র দুটি কুকুরকেই নিয়োগ করা হত না, প্রত্যেক ঘাঁটিতেই কিছুসংখ্যক কুকুর থাকত। যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গারোহণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে একটি কুকুরকে যেতে দেখা গিয়েছিল,—এই উপাখ্যান সকলেরই জানা। তিনি পিতৃযানই অনুসরণ করেছিলেন, কারণ যম স্বয়ং অলক্ষ্যে তাঁর প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। স্বর্গপথে তাঁর সঙ্গে কুকুরের নিয়োগ স্বভাবতই এই প্রাচীন প্রথাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নে (১।৯) যে আলোচনা আছে তা থেকে অনুমান হয় পিতৃযানগুলি দক্ষিণ অঞ্চলেই সমধিক প্রসারিত ছিল এবং এই

অঞ্চলেই সন্তানার্থী ঋষিরা গমনাগমন করতেন। এই অঞ্চলের পথগুলিকে 'রয়ি' বলা হত। 'এষ হ বৈ রয়ির্য পিতৃযানঃ।' 'রয়ি' শব্দে ধনসম্পদও বোঝায়। এই অঞ্চলে ইষ্টাপূর্ত অর্থাৎ যাগাদি কর্ম এবং বাপী, কূপ খননাদি কর্ম সম্পাদিত হত বলেই বোধ হয় বিশেষ করে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে অপ্সরাগণ কুকুর নিয়ে এইসব মার্গে বিচরণ করতেন। অপ্‌ বা জলের নিকট বাস করতেন বলেই তাঁদের বলা হত অপ্সরা। স্বর্গবাসিগণ এইসব পথে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য মনোহর তড়াগ ও জলাশয় স্থাপন করতেন এবং এইসব স্থানের পাহারায় থাকতেন অপ্সরা ও তাঁদের সহচর গন্ধর্ববৃন্দ। ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক,—উভয় উপনিষদেই দেবযান ও পিতৃযানের উল্লেখ আছে। তাঁরা বলছেন দেবযান অর্চির পথ এবং পিতৃযান ধূমের পথ, কেন না যাগযজ্ঞের আধিক্যবশতঃ এই পথগুলি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। কৌষিতকী উপনিষদেও অনুরূপ মতই প্রকাশ করা হয়েছে।

এই দুটি পথ ছাড়া আর একটি পথের উল্লেখ আবশ্যক। এটি হচ্ছে বিমান পথ, বিমান অর্থে আদিতে আকাশে বা শূন্যস্থলে পরিভ্রমণকারী যান বোঝাতো না। এটিও পরবর্তী কালের পরিকল্পনা, যেমন মৃত্যুর পরে দেবযান বা পিতৃযান পথে আত্মার মহাপ্রয়াণের ধারণা ঘটেছে। বিমান শব্দে বোঝাতো উচ্চভূমিতে (অন্তরীক্ষপথ) বিচরণশীল এক প্রকার বিশেষ যান। এক প্রকার উচ্চ মার্গকেও বিমান বলে নির্দেশ করা হত। বিমান আখ্যাটির সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিশেষভাবে জড়িত, কারণ তাঁরাই সম্ভবতঃ এই মার্গ এবং যানের প্রবর্তক। অথর্ব বেদীয় একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—"অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাদের পথ সুগম করুন, যাতে তোমরা সবান্ধবে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পার। (অথর্ব ৩। ৩। ৪)।" এতে বোঝা যাচ্ছে যে অশ্বিদ্বয় পথকে সুগম করবার কাজে দক্ষ ছিলেন। এর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, সেটি হচ্ছে এই যে, উৎকৃষ্ট যান চলাচলের জন্য মসৃণ সুগম্য পথ আবশ্যক, যে কোনও পথই যানবাহন চলবার উপযুক্ত নয়। অশ্বিনীকুমারেরা এই কাজে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা না কি পৃথিবীর পরিমাপও করেছিলেন (অথর্ব ১২। ১। ১০)। এতে প্রমাণিত হয় ভূ-বিজ্ঞানে তাঁদের অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং তাঁরা যে বিশেষভাবে মাপজোক করে উৎকৃষ্ট পথ প্রস্তুত করতে সমর্থ হবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিশেষ

মাপের পথ বলেই তো তার আখ্যা হয়েছিল বিমান। আরও একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে এই যে তাঁরা 'অনশ্ব রথ' পরিচালনা করতেন (ঋ ১।১১২।১২, ১।১২০।১০)। এই অশ্বরহিত যানটি কিভাবে চালিত হত সে সম্বন্ধে কিন্তু কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নি। পার্বত্য প্রদেশে এমন অনেক ঘটনার অভ্যুদয় হত যখন উচ্চপথে অশ্ব বা গো প্রভৃতি পশুকে যানে যুক্ত করা সম্ভব হত না, অথচ যানের ব্যবহার করতে হত। সেই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে নির্মিত যান ছিল এই অনশ্ব রথ। এ সম্বন্ধে একটি ইতিবৃত্ত আছে (ঋ ১।১১৬।৩, ৫; ঋ ১।১৮২।৬) আখ্যায়িকাটি এইরূপ। রাজা তুগ্র তাঁর পুত্র ভুজ্যুকে শত্রু-বিনাশের জন্য সামুদ্রিক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। সেই বিপদসঙ্কুল অভিযানে তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন। অগাধ জলরাশির মধ্যে যখন তিনি মুক্তির কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে সদলবলে জলে সঞ্চরণশীল নৌযানে এবং অন্তরীক্ষে সঞ্চরণশীল যানে উদ্ধার করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলেছেন—"জলের মধ্যে আবদ্ধ আদি-অন্তহীন অন্ধকারে প্রপীড়িত তুগ্রপুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবিষ্ট অশ্বিদেব কর্তৃক প্রেরিত চারটি নৌকা উপরে উঠিয়ে পারে পৌঁছে দিয়েছিল (ঋ ১।১৮২।৬)। আরও একটি মন্ত্রে (ঋ ১।১১৬।৩) বলা হয়েছে অশ্বিনীদ্বয় স্বীয় শক্তিতে যুক্ত হয়ে অন্তরীক্ষে সঞ্চরণশীল এবং জলবিদারণপূর্বক সঞ্চরণকারী নৌযান দ্বারা ভুজ্যুকে উপরে উদ্ধার করেছিলেন। অন্তরীক্ষে সঞ্চরণশীল, যাকে ঋকমন্ত্রে 'অন্তরিক্ষপ্রুদ্' বলা হয়েছে—তার স্বাভাবিক অর্থ 'ব্রীজ'-এর মত উচ্চপথের উপর দিয়ে গমনকারী যান। বর্তমান যুগের ফ্লাইওভার বা উড়ালপুলও এই অন্তরীক্ষপথ বা বিমানমার্গ। অথর্ববেদে বলা হয়েছে—"যস্যাসৌ পন্থা রজসো বিমানঃ", অর্থাৎ যাঁর এই বিমানপন্থায় আরোহণের জন্য শক্তির প্রয়োজন (অথর্ব ৪।২।৩)। যাই হোক, এই উদ্ধার কার্য কিন্তু সহজে হয় নি। ঋগ্বেদের আর একটি মন্ত্রে এই কাহিনী জানা যায়। নাসত্যদ্বয় (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) সমুদ্রপারে মরুদেশে তিনরাত্রি এবং তিনদিন সমানে অত্যন্ত দ্রুতগামী শতপদযুক্ত ছয়টি অশ্ববাহিত তিনটি যানে পতঙ্গের মত ভুজ্যুকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে এসেছিলেন (ঋ ১।১১৬।৪)। সমুদ্র থেকে বেলাভূমি পর্যন্ত আনতে শতবৈঠাযুক্ত নৌকা ব্যবহৃত হয়েছিল (ঋ ১।১১৬।৫)। সব মিলিয়ে এই ধারণাই হয় যে নাসত্যদ্বয় বহু বিরাট নৌযান

নিয়োগ করে এবং বিচিত্র বৃহৎ শকট সহযোগে এক অন্তরীক্ষপথ অতিক্রম করে যুবরাজ ভুজ্যুকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বোধ করি বালুকাময় বেলাভূমি অতিক্রম করাটা দুঃসাধ্য বলেই অন্তরীক্ষপথ নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে ঋভুগণ নাসত্যদ্বয়ের জন্য সর্বত্রগমনযোগ্য (পরিজ্মানম্— পরিতো গন্তারম্—সায়ণভাষ্য, সুখকর রথ নির্মাণ করেছিলেন। এই রথে সৌন্দর্যসম্পাদনের জন্য বিচিত্র কামধেনুর খোদিত মূর্তিও স্থাপিত হয়েছিল (ঋ ১।২০।৩)। এতে মনে হয় কেবল অশ্বিনীদ্বয়ই নন ঋভুগণও পথ এবং যানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হয়েছিলেন।

বহু মর্ত্যবাসী বিবিধ প্রয়োজনে অথবা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য স্বর্গলোকের এইসব গুপ্তপথের অনুসন্ধান করতেন। এঁদের অধিকাংশই হতেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থাদিতে এ সম্পর্কে বহু আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। বহু সামের আখ্যানভাগে এই সব কাহিনী জড়িত আছে। উদাহরণস্বরূপ শ্যাবাশ্ব সাম, গৌতম সাম, বসিষ্ঠ সাম, সৌদন্তীয় সাম, শৌক্ত সাম, ঔর্ণায়ব সাম, ঔক্ষরন্ধ্র সাম, শ্রৌষ্ঠ সাম, সৌহবিষ সাম, পৌরুহন্মন সাম, আসিত সাম, ঐধ্মবাহ সাম—এইগুলির উল্লেখ করা যায়। কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য যে আখ্যায়িকাগুলিকে অবলম্বন করে এই সামগুলি খ্যাতিলাভ করেছে তার মধ্যে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক আখ্যানভাগ এখানে উদ্ধৃত করা যাক।

ঔর্ণায়ব সামের ঘটনাটি এইরূপ। একদা অঙ্গিরসগণ একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ স্বর্গরাজ্যে পৌছোতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্গলোকে দেবতাদের আবাসস্থল তাঁরা নির্ণয় করতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে কল্যাণ নামক একজন তাঁর সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে নিজে সেই পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি ঊর্ণায়ু নামক এক গন্ধর্বের দেখা পেলেন। উক্ত গন্ধর্ব তখন অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ায় রত ছিলেন। কিন্তু কল্যাণকে দেখে তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—"তুমিতো দেখছি যেন একটি দলবল নিয়ে স্বর্গরাজ্যে এসে পড়েছ; তবে দেবতাদের বাসস্থান যে পথে তা খুঁজে পাচ্ছ না।" এই বলে তিনি তাঁকে একটি বিশেষ সাম গাইতে উপদেশ দিলেন যার ফলে অভীষ্ট স্থানে পৌছানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। তবে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—"তুমি যেন তোমার সঙ্গীদের বোলো না যে তুমিই এই সামটি প্রত্যক্ষ করেছ।" কল্যাণ তাঁর সঙ্গীদের

কাছে ফিরে এসে বললেন—"স্বর্গরাজ্যের যে পথে দেবগণ অধিষ্ঠান করেন সেটি আমি জানতে পেরেছি। তোমরা এই সামটি আচরণ কর তাহলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।" তাঁর সঙ্গীরা তখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন—"এই সাম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিলেন কে?" কল্যাণ কিন্তু সত্যগোপন করে বললেন "আমিই এই সামটি প্রত্যক্ষ করছি।" অতঃপর সকলেই সেই সামটি আচরণ করে দেবপথে প্রস্থান করলেন, কিন্তু মিথ্যাচরণের জন্য কল্যাণ নিজে সেখানে যেতে সমর্থ হলেন না। তিনি পৃথিবীতে শ্বেতকুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে কথিত ঔক্ষরন্ধ্র সামের কাহিনীটি এইরূপ। কবির পুত্র উক্ষরন্ধ্র যমুনা নদীতে পরিভ্রমণ করছিলেন এবং তিনি জলপথে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছোবার বাসনা করেছিলেন। যখন তিনি যমুনায় অবস্থিত তখন একটি বিশেষ সাম তাঁর প্রত্যক্ষ গোচর হয়। এই সামটি আচরণ করে তিনি ঊর্ধ্বদেশে একটি নৌযান দেখতে পেলেন এবং তার সাহায্যে ক্রমাগত উপরে যেতে যেতে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছোতে সমর্থ হলেন।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে আসিত সামের যে আখ্যায়িকা প্রদান করা হয়েছে তার সারাংশ এইরূপ। কয়েক জন ঋষি স্বর্গের পথ অনুসন্ধান করছিলেন। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে অথর্বণদের অন্বেষণ করতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে সোমাহিতের পুত্র প্রেণিন্, বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দস্, দেবলের পুত্র অসিত এবং অপর যাঁরা স্বর্গরাজ্যে যাবার অভিলাষী তাঁদেরও ডেকে আনলেন। অথর্বণগণ জানতে পারলেন যে এই ঋষিরা তাঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তখন উদ্বস্ত নামক একজন অথর্বণ একপাত্র সোমরস হাতে নিয়ে তাঁদের কাছে এলেন। তিনি এইসব ঋষিদের নানা প্রশ্ন করলেন কিন্তু কারুর উত্তরই সন্তোষজনক হল না। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে এঁদের কেউই স্বর্গরাজ্যের পথে পা বাড়াবার উপযুক্ত নন। অবশেষে দেবলপুত্র অসিত বললেন—"আমি আর কিছু চাই না, কেবল তোমার হাতের পাত্রে সোমরসটুকু দেখতে চাই"। উদ্বস্ত তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, "তুমি যথার্থ বস্তু নির্বাচন করেছ। অসিত যখন সোমরস পর্যবেক্ষণ করছিলেন তখন একটি বিশেষ সাম তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হল এবং এটি গান করে তিনি শুধু স্বর্গলোকেই নয়, ত্রিলোকেই বিচরণ করবার সুযোগ লাভ করলেন।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের আর একটি কাহিনী অনুসারে ইষ্মবাহ নামক একজন

ঋষির স্বর্গে গমনের সংবাদ জানা যায়। কয়েকজন ঋষি স্বর্গের উদ্দেশে গমন করবার সময় ইধ্মবাহকে ফেলে যান। উক্ত ঋষি সেই সময় কাষ্ঠ আহরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি যথাস্থানে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গীদের দেখতে না পেয়ে অতিশয় কাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি দূর থেকে কশাঘাতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। বোধ হয় উক্ত ঋষির দল অশ্বারোহণে যাচ্ছিলেন অথবা কোনও কারণে তাঁদের কশাঘাত করতে করতে চলতে হচ্ছিল। এই সময় তিনি একটি মন্ত্র প্রত্যক্ষ করে গাইতে লাগলেন। এই মন্ত্রটির অর্থ হচ্ছে—"এঁদের হস্তধৃত কশা (চাবুক) যে শব্দ করছে তা আমি এখানে অবস্থান করেও শুনতে পাচ্ছি। এ ধ্বনি বিচিত্র শক্তি প্রদান করে।" এর সঙ্গে আর একটি সাম আচরণ করে অবশেষে তিনি স্বর্গলোকে পৌঁছোতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অপর কয়েকটি সাম সম্পর্কে তেমন কোনও আখ্যায়িকার বর্ণনা নেই, তবে কয়েকজন ঋষির নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে তাঁরা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি সাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেগুলি আচরণপূর্বক তাঁরা স্বর্গলোকে পৌঁছোতে সমর্থ হয়েছিলেন। অর্থাৎ, সবকটি সামের কাহিনীতে স্বর্গলোকের পথে ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে এবং সুকঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অনেককে দেবরাজ্যে প্রবেশ করতেও দেওয়া হয়েছে। ঔক্ষরন্ধ্র সামের আখ্যায়িকা থেকে একটি অসামান্য প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। বৈদিকযুগের প্রখ্যাত ঋষি-কবির পুত্র উক্ষরন্ধ্র যমুনা নদী থেকে ক্রমাগত জলপথে একটি নৌযান যোগে পরিভ্রমণ করে বহু ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে পৌঁছোতে সমর্থ হন। এই ঘটনায় প্রমাণ হয় যে নদীপথেও কষ্ট করে স্বর্গলোকে পৌঁছোনো যেত, অথবা এমন কাছাকাছি পৌঁছোনো যেত যে বাকি পথ অতিক্রম করতে বিশেষ বেগ পেতে হত না। সাম্প্রতিক কালেও নদীপথ অতিক্রম করে শ্রীনগর থেকে বহু উচ্চে ওঠার একটি অভিযান সার্থক হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। কিন্তু এটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খরস্রোতা নদী যখন পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহিত থাকে তখন তার ভেতর দিয়ে নৌযান পরিচালনা করা এযুগেও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অতএব এই ধারণা দৃঢ় হয় যে যতটা পথ নাব্য হওয়া সম্ভব ততটাই তাঁরা অভিযান করতে পেরেছিলেন, বাকি পথটুকু পার্বত্য অঞ্চলে পদব্রজেই অতিক্রম করে স্বর্গলোকের দ্বারদেশে তাঁরা উপস্থিত হতে পেরেছিলেন।

এই যে পিতৃযান, দেবযান প্রভৃতি দেবমার্গের সঙ্গে মর্ত্যবাসীদের যোগাযোগ,

—এ অতি সুদূর অতীতের কথা। ক্রমে সেগুলি বহুলাংশে কমে এসেছিল এবং বিলীয়মান দেবসভ্যতার শেষ বিলুপ্তি ঘটায় এই সমস্ত পথ রক্ষা করাও সাধ্যায়ত্ত হয় নি। ফলে এগুলিকে অরণ্য গ্রাস করে ফেলেছিল এবং নানা কারণে নানাভাবে এই বিরাট পার্বত্য প্রদেশের ভৌগোলিক পরিবর্তন যে কতবার ঘটেছে তা বলাও বোধ করি সম্ভব নয়। কিন্তু এই সব মার্গের ঐতিহ্য মানবসংস্কারে এত দৃঢ় হয়ে বসে গিয়েছিল যে মৃত্যুর পরে পরলোকগত আত্মার এই দুটি পথে গতির একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, যেটা পরে বিশ্বাসে পরিণত হয়।

বেদের সংহিতাসাহিত্যে ইন্দ্র আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর বংশগত ঐতিহ্যের পরিচয় ঠিকমত পাওয়া যায় না। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে তিনি কুণ্ডপায্যের প্রপৌত্র শৃঙ্গবৃষের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (অ ২০।১। ৭)। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—"হে ইন্দ্র, তোমাকে দেবজাতীয়া ভদ্রা জনিত্রী জন্মপ্রদান করেছিলেন (ঋ ১০।১৩৪।২)।" এতে মনে হয় তাঁর মার নাম ছিল ভদ্রা। কোনও মন্ত্রে আবার, নিষ্টিগ্রী বা অদিতিকেও তাঁর মা বলা হয়েছে। ইন্দ্রের ভাই ছিলেন না বলেই মনে হয়। জন্মাবধি তিনি প্রতিভাবান এবং বলশালী। তরুণ বয়সেই তিনি নেতা হিসাবে দেবসমাজে অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। মন্ত্রাদিতে তাঁকে যুবা ইন্দ্র বলা হয়েছে। তিনি বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনও গুরুর নাম সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই।

যৌবনে তাঁর চেহারার বর্ণনা বিভিন্ন বেদমন্ত্রে আছে। তিনি ছিলেন প্রিয়-দর্শন। তাঁর চোখদুটি ছিল দীর্ঘায়ত। বীরসুলভ শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত ছিল তাঁর মুখমণ্ডল। তিনি স্বর্ণাভ কেশযুক্ত ছিলেন, তাই তাঁকে বলা হত হরিকেশ (অ ২০। ৩০। ৫)। তাঁর গ্রীবাদেশ ছিল দৃঢ় এবং সুগঠিত বাহুদ্বয় ছিল বিশাল। তাঁর প্রশস্ত বক্ষদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ বিচিত্র বর্মে শোভিত থাকত। তাঁর মস্তকে শোভা পেত অতি সুদৃশ্য শিরস্ত্রাণ। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল উগ্র। তাঁকে দেখলে ভয়ের উদ্রেক হত। তাঁর অমিত শক্তির জন্য তাঁকে অসুর ইন্দ্রও বলা হয়েছে। একটি মন্ত্রে ইন্দ্রাণী বলছেন—"হে ইন্দ্র, তুমি আমার পিতার চেয়ে অধিক ধনবান। আমার যে ভ্রাতা ভক্ষ্যদ্রব্য দিতে অনিচ্ছুক, তার চেয়ে তুমি অনেক ভাল। তুমি আমার মাতার সমবয়সী (ঋ ৮। ১। ৬)।" এতে মনে হয় ইন্দ্র তাঁর স্ত্রীর চেয়ে অনেকটাই বড় ছিলেন বয়সে।

বৃত্রবিজয়ী ইন্দ্রের যুগকেই স্বর্গরাজ্যের সুবর্ণযুগ বলা যায়। সমগ্র দেবভূমিতে তখন সুবর্ণ এবং ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। দেবরক্ষিত মর্ত্যবাসীদের সুপ্রচুর উপঢৌকনে সেই প্রাচুর্য আরও অধিক স্ফীত হয়েছিল। আগুন তখন দেবতাদের আয়ত্তে এসে গেছে। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি অগ্নির দীপ্তি যাতে সমানভাবে রক্ষিত হয়

বা বাড়ানো কমানো যায়—সে উপায়ও বের করেছেন ; অর্থাৎ প্রদীপের উদ্ভাবনও হয়েছে। অতএব, অন্ধকার বনভূমিতে পথ অতিক্রম করা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছিল। অথর্বণগণ না কি পথঘাট নির্মাণে সুদক্ষ ছিলেন,—একথাও জানা যায়। কিন্তু ধনরত্ন যতই থাকুক দেবতারা কৃষি ও গোসম্পদের দিকেই বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ইন্দ্র নিজে হল চালনা করতেন এমন উল্লেখ আছে (অ ৩।১৭।৪)। গো-পালন দেবতাদের একটি ধর্ম ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। ঋষি উশনা গোদুগ্ধ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। দুগ্ধবিজ্ঞানে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইন্দ্রের নিজস্ব বৃহৎ খামার ছিল যাতে উত্তম কৃষি, গো-পালন এবং অশ্বরক্ষণ করা হত। ইন্দ্র নানাস্থান থেকে উৎকৃষ্ট গাভী তাঁর গো-পালনের জন্য আহরণ করেছিলেন এবং সেগুলি অতি যত্নে প্রতিপালিত হত। অশ্বও তাঁর অতি প্রিয় ছিল,—এই কারণে তাঁকে বলা হত অশ্বপতি।

ইন্দ্র থাকতেন একটি পার্বত্য দুর্গে, যাকে আমরা কেল্লা বলি। এই জন্য তাঁর আর এক নাম অদ্রিবঃ। প্রায়ই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হত বলে এইটিই ছিল তাঁর প্রধান আশ্রয়। এখান থেকে তাঁর যাতায়াতের প্রধান নির্ভর ছিল রথ। রথচালনায় অতিশয় দক্ষ ছিলেন তিনি। সাধারণতঃ তাঁর রথ ছিল ছোট, তাতে দুটি অশ্ব যুক্ত হত, যাদের বলা হত 'হরি'। এই ঘোড়া দুটি তাঁকে না কি দিয়েছিলেন কশ্যপ। এরা দেখতে ছিল চমৎকার। তাদের স্কন্ধে ছিল ঘন এবং সুদৃশ্য কেশ। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—"হে ইন্দ্র, তুমি হর্ষে গমনকারী ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ বিচিত্র রঙের অশ্বযুক্ত রথে আগমন কর।" তাঁর সুসজ্জিত স্বর্ণালঙ্কৃত বৃহৎ রথকে বলা হত হিরণ্যরথ। যখন তিনি রাজকীয় সমারোহে যাত্রা করতেন তখন সেই রথকে আরও সুশোভিত করা হত। কারুগণ স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে চলতেন তাঁর সঙ্গে। ইন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট কারু বা গায়ক ছিলেন সাতজন। এঁরা মন্ত্রাদিতে সপ্তকারু বলে উল্লিখিত। তবে, ইন্দ্র বিশেষ করে ঋষি কণ্ব ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্তোত্রাদি শুনতে বিশেষ ভালবাসতেন। ইন্দ্রের চার বন্ধু ছিলেন—রুম, রুশম, শ্যাবক এবং কৃপ। এঁদের সঙ্গে একত্রে বসে তিনি ঋষি কণ্বের কাছ থেকে স্তোত্রবন্দনা শুনতেন। 'বৃহৎ' নামক একটি বিখ্যাত সাম ইন্দ্রের প্রিয় ছিল—গাথিগণ এই সামটি তাঁকে গেয়ে শোনাতেন। 'উক্থ' সঙ্গীতেও তিনি তুষ্ট হতেন। কারু ব্যতীত ঋভুগণও তাঁকে গান শোনাতেন।

ইন্দ্র যখন সসৈন্যে অভিযানে বেরুতেন তখন সেটি একটি চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা করত। তাঁর পরেই অগ্রবর্তী সৈন্যেরা কেতু বা নিশান উড্ডীন রাখতেন। সকলের শীর্ষে থাকতেন ভীষণদর্শন মরুৎ সেনাগণ। মধ্যভাগে দুর্ধর্ষ দেবসৈন্যগণ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতেন। ইন্দ্রের রথের দক্ষিণেই থাকতেন বৃহস্পতি। সেই সঙ্গে একদল সৈন্য সোমরসবাহিত একটি শকট রক্ষা করে অগ্রসর হতেন। সকলের এগিয়ে যাবার তালে তালে বাজত গম্ভীরনাদী ভেরী এবং দুন্দুভি।

ইন্দ্রের ডান হাতে সচরাচর যে ভয়াবহ অস্ত্রটি থাকত সেটি বজ্র নামে পরিচিত ছিল। ত্বষ্টা নিজেই নাকি ইন্দ্রের জন্য লৌহ থেকে বজ্র প্রস্তুত করেছিলেন। এই বজ্রে হরিদ্বর্ণের আভা ছিল। হয়তো বা তার কোনও কোনও অংশ ছিল সোনা দিয়ে মোড়া। বস্তুতঃ ইন্দ্রের সাজসজ্জায় স্বর্ণ-অলঙ্কারের অভাব ছিল না। তাঁর আরও দুটি তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল স্বক্ এবং পবি, যাদের হনন ক্ষমতাও কম ছিল না। দরকার হলে ইন্দ্র চক্র ধারণ করতেন। আবার বাণ নিক্ষেপেও তিনি কুশলী ছিলেন। তাঁকে উগ্রধন্বা বলা হয়েছে। একটি মন্ত্রে আছে ইন্দ্র তাঁর তূণের শাণিত শায়কে একক যুদ্ধে কুবি-কে পরাজিত করেছিলেন। তিনি তরবারিযুদ্ধেও পারদর্শী ছিলেন। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে ইন্দ্র তাঁর তীব্র পদক্ষেপসমূহের ছায়াপাত ঘটতে দেখলে আনন্দিত হতেন এবং সেই ছায়ার সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হতেন। তৎকালে সম্মুখযুদ্ধে গদা বা অসিসমূহ সঞ্চালন করবার সময় বিবিধ কৌশলযুক্ত পদক্ষেপের নিয়ম ছিল। কেবলমাত্র বাহুবল অবলম্বনেও ইন্দ্র বহু শত্রুকে পরাভূত করেছিলেন।

ইন্দ্র খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন অসুর বৃত্র গোষ্ঠীর মহানায়ককে বিনাশ করে। এতে ইন্দ্রের অধিকৃত স্বর্গরাজ্যের চতুস্পার্শে মহাপরাক্রান্ত অসুরশক্তি একটা প্রচণ্ড রকমের ঘা খায় এবং যদিচ তাঁরা এর পরেও দেবগণের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিলেন, তথাপি ইন্দ্রের জীবিতকালে তাঁদের গৌরবকে আর ফিরে পান নি।

মহাশক্তিধর বৃত্রকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না, যেটুকু পাওয়া যায় তাও রহস্যময় এবং বহুলাংশে অবিশ্বাস্য। আসল ব্যাপারটা এই যে, বৃত্র বহুবারই ইন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কৌশল অবলম্বন করেও সফলকাম হতে পারেন নি। শেষবারে তিনি শ্রেষ্ঠ, বাছাই-করা অসুরসৈন্য সহ পর্বতবেষ্টিত শর্যনাবতী নামক একটি সরোবরের তীরে ইন্দ্রের

সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি ইন্দ্র ছিলেন তাঁর চেয়েও অধিক কৌশলী এবং তাঁর ফাঁদেই তিনি পা বাড়িয়েছেন। এই সংঘাতেই তিনি অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

এ সম্বন্ধে প্রচলিত আখ্যায়িকা যেটি প্রাচীনতম সেটি জানা যায় বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থ থেকে। সংক্ষেপে কাহিনীটি এইরূপ—

ইন্দ্র অথর্বণের পুত্র দধ্যঙ্ককে (দধীচ বা দধীচি) মধুতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি গূঢ় উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এই তত্ত্বের মূলে রয়েছে সূর্যের আলো—যা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং চন্দ্রকে আলোকিত করে মধু সৃষ্টির সহায়তা করছে। এই উপদেশ প্রদান করে ইন্দ্র তাঁকে সাবধান করে বলেছিলেন—"এই বিদ্যার কথা কারুর কাছে প্রকাশ কোরো না, যদি করো তাহলে তোমাকে আমি জীবন্ত রাখব না।" খবরটা কিন্তু অশ্বিনীকুমারদের কাছে পৌছোল। তাঁরা গোপনে এসে ঋষির কাছে এই তত্ত্বটি জানতে চাইলেন। ঋষি বললেন—এ তত্ত্ব প্রকাশ করলে তাঁর প্রাণ সংশয় হবে। অশ্বিনীযুগল তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন—"এক কাজ করো, আমরা তোমার মাথাটা খুলে নিয়ে সেখানে একটা অশ্বশির বসিয়ে দিচ্ছি। তুমি তার মাধ্যমে বিদ্যাটি আমাদের গোচর কর। তাহলে ইন্দ্র তোমার সেই অশ্বশিরটিই ছেদন করবেন, তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না, কারণ আমরা আবার তোমার আসল মাথা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেব।" দধ্যঙ্ক তখন সেই অশ্বশিরের মাধ্যমেই উক্ত মধুবিদ্যা অশ্বিনীকুমারদের কাছে বিবৃত করলেন। কিন্তু ইন্দ্র সমস্ত ব্যাপারটি জানতে পেরে বজ্র দিয়ে ঋষির সেই অশ্বমুখ ছেদন করে দূরে নিক্ষেপ করলেন। সেটি গিয়ে পড়ল শর্যনাবৎ পর্বতে অবস্থিত একটি সরোবরের মধ্যে। অতঃপর সেই অশ্বশির জল থেকে উঠে জগতের বহু হিতসাধন করে (অর্থাৎ বৃত্রের হত্যাসাধন করে) আবার যুগান্তকালের জন্য সেই সরোবরেই নিমজ্জিত হয়ে রইল। ওদিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঋষির নিজের মাথাটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে তাঁকে নিশ্চিন্ত করলেন।

অপর আখ্যায়িকাসমূহে আছে—ইন্দ্র দধীচিকে হত্যা করেছিলেন এবং তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করে বৃত্রকে বধ করেছিলেন। আবার এরকম কাহিনীও আছে যে দধীচি স্বেচ্ছায় নিজের অস্থি প্রদান করেছিলে ইন্দ্রকে বৃত্র হননের যোগ্য বজ্র প্রস্তুতের জন্য।

মূল বৈদিক সংহিতাভাগে এ সম্বন্ধে কি আছে সেটি পর্যালোচনা করা যাক। ঋগ্বেদের তিনটি মন্ত্রে এই রকম বলা হয়েছে—

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচের অস্থিসমূহদ্বারা নবনবতি সংখ্যক বৃত্রকে সংহার করেছিলেন (ঋ ১।৮৪।১৩)।

পর্বতে রক্ষিত যে অশ্বশির তিনি ইচ্ছা করেছিলেন তাকে শর্যনাবৎ পর্বতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন (ঋ ১।৮৪।১৪)।

গতিশীল চন্দ্রমার মণ্ডলে সূর্যের কিরণসমূহ গোপনে প্রকাশিত হয়, এইরূপ ধারণা করা হয় (ঋ ১।৮৪।১৫)।

শেষের মন্ত্রটি হচ্ছে মধুতত্ত্ব। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে সূর্যালোকের প্রতিফলনের কথা কেন উঠছে সেটা আগে বিচার করা যাক। ব্যাপারটা সোমলতার চাষ নিয়ে। সুমিষ্ট সোমরসকেই মধুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আসলে ইন্দ্রপ্রদত্ত মধুবিদ্যা হচ্ছে সোমের উৎপাদন, প্রতিপালন এবং রসনিষ্কাশন-সম্বন্ধীয় বিদ্যা। সোমলতা নাকি শুক্লপক্ষেই অধিক বর্ধিত হত। সূর্যের আলোকেই চন্দ্র আলোকিত। আসল আলো সূর্যেরই এবং এই আলোতেই বৃক্ষলতাদি সঞ্জীবিত থাকছে, তাতে ফল ধরছে, ফুল ফুটছে এবং মধু সঞ্চিত হচ্ছে; শুক্লপক্ষে চন্দ্রালোকের প্রাচুর্যে সোমলতাকে বর্ধিত করবার কতকগুলি বিশেষ পরিচর্যা অবশ্যই প্রচলিত ছিল। ইন্দ্র সেগুলি নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন দধীচের সাহায্যে। সোম জন্মাতো উঁচু পাহাড়ে বা তৎসন্নিহিত সরোবরে। শর্যণাবৎ পর্বতে এবং তত্রাবস্থিত হ্রদেই এই সোমের উৎপাদন করা হচ্ছিল। সম্ভবতঃ এটি ছিল একটি বিশেষ প্রকারের সোম যা স্বয়ং ইন্দ্রের তত্ত্বাবধানে বর্ধিত হচ্ছিল।

বৃত্রও এই খবরটি রেখেছিলেন এবং তিনিও সহচর পরিবৃত হয়ে কাছে কাছেই ঘোরাফেরা করছিলেন। ইন্দ্র দেখলেন বৃত্রকে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই কাছে পেয়েছেন এবং এই দুর্গম পর্বতসঙ্কুল প্রদেশে বৃত্রকে সংহার করবার একটি উৎকৃষ্ট সুযোগের প্রতীক্ষায় তিনি রইলেন। অতঃপর বৃত্রকে ফাঁদে ফেলবার জন্য একটি নকল সৈন্যসমাবেশের পরিকল্পনা করা হল যাতে বৃত্র সহজে যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দধীচ কিছু নরকঙ্কাল সংগ্রহ করে সেগুলিকে দেবসৈন্যের মত সাজিয়েছিলেন। দধীচের অস্থি বলতে এইটাই বোঝায়, নতুবা

একজনের দেহের অস্থি নিয়ে এমন কোনও অস্ত্র তৈরি করা যায় না যা দিয়ে নবনবতি সংখ্যক অসুরকে বিনাশ করা সম্ভব। দধীচের ঘাড়ে ঘোড়ার মাথা বসিয়ে দেওয়া তো উদ্ভট অলীক কল্পনা, ছেলেভুলোনো গল্পমাত্র। তাছাড়া, ইন্দ্র কখনই ঋষিহত্যা করবার মত লোক ছিলেন না। দধ্যঞ্চ বা দধীচকে আদৌ হত্যা করা হয় নি বা অশ্বিনীদ্বয়ের প্রতিও ইন্দ্রের কোনও বিজাতীয় মনোভাব ছিল না. পরন্তু তাঁরা দেবহিতৈষী বিজ্ঞানী ছিলেন। ইন্দ্র তাঁদের একান্ত আস্থাভাজন বন্ধু ছিলেন এবং সব বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই কাজ করতেন। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা চক্রান্ত, বৃত্রকে ফাঁদে ফেলবার একটা চতুর পরিকল্পনা।

সে যুগে যুদ্ধবিগ্রহের অন্ত ছিল না এবং কঙ্কাল সংগ্রহ করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপারও ছিল না। শর্যনাবৎ পাহাড়েই হয়তো কোনও সময়ে যুদ্ধে নিহত বহু ব্যক্তি এবং অশ্বের কঙ্কাল পড়েছিল। এই সেদিনও হিমালয়ের রূপকুণ্ডে এই রকম বহু কঙ্কাল পাওয়া গেছে। অশ্বশিরের অস্থিকেও ইন্দ্রের অশ্বমুখের আকৃতি প্রদান করা হয় এবং সেগুলি এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে ভ্রম হয় যে ইন্দ্রই সহচর পরিবৃত হয়ে সেখানে অবস্থান করছেন। হয়তো কোনও এক চন্দ্রালোকিত নিশীথেই এই ফাঁদটা পাতা হয়েছিল। শেষ রাতের আবছা আলোয় বৃত্র মনে করলেন উত্তম সুযোগ উপস্থিত। অরক্ষিত মুহূর্ত বুঝে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইন্দ্রের 'ডামি' সৈন্যদের উপর। তাঁর মাতা সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর কি রকম সন্দেহ হয়েছিল, তিনি পুত্রের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে করতে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা পুত্রের কর্ণগোচর হয় নি। সেই মুহূর্তেই দেবসৈন্যেরা শর্যণাবতের চতুর্দিকে অবরোধ করে ফেললেন। পালাবার পথ নেই। চারদিকে উঁচু পাহাড় আর মধ্যস্থলে সরোবর। অবরুদ্ধ বৃত্র শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। এই মৃত্যু অতি কঠোর। ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বৃত্রের হস্তপদ ছিন্ন ক'রে ফেললেন। তারপর তাঁর বিশাল স্কন্ধে বজ্র প্রহার করলেন। প্রচণ্ডভাবে আহত বৃত্র হ্রদের জলে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর মাতা পুত্রের দেহকে অবরোধ করে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু ইন্দ্র মাতার অধোভাগে অবস্থিত পুত্রকে প্রহার করে বধ করলেন এবং সেই দানবী মাতাও জীবিত রইলেন না। এইভাবে সেই দুটি মৃতদেহের উপর জল প্রবাহিত হতে লাগল রক্তে রাঙা হয়ে। তাদের আর কোনও গতি উভয় পক্ষের কেহই করলেন না। এই রকমই ছিল তখন যুদ্ধে পরাজিতদের শোচনীয় পরিণতি।

একমাত্র এইরকম একটি ব্যাপার ছাড়া আর কোনও সিদ্ধান্ত এইসব মন্ত্রোক্ত বিবরণ থেকে করা যায় না। বৃত্রনিধনের সময় ইন্দ্রের সবচেয়ে বড় সহায় এবং বুদ্ধিদাতা বৃহস্পতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সদলবলে গাইতে লাগলেন ইন্দ্রের স্তুতি যাতে ইন্দ্র অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। দেবসেনা পরিবেষ্টিত বৃত্রের মস্তিষ্কের সীমাদেশ বিদীর্ণ করে ইন্দ্র কম্বুকণ্ঠে 'মহ্যাং' বলে সাফল্যের সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন। 'মহ্যাং' ধ্বনিটির ব্যাখ্যা করে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে এটি 'মহান্ ঘোষঃ' অর্থাৎ মহাশব্দ সূচনা করে। যুদ্ধে জয়লাভ করে ইন্দ্র 'মহ্যাং' এই ধ্বনি তুলতেন। বৃহস্পতি যে মন্ত্রগুলি সমবেতকণ্ঠে গান করে ইন্দ্রকে উৎসাহিত করেছিলেন সেগুলি বৈদিক সংহিতায় মহানাম্নী আর্চিক বলে বিখ্যাত।

অসুরেরা যে সোমসম্বন্ধে জানবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন তারও প্রমাণ আছে। ত্বষ্টা ছিলেন সোমসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। যদিও তিনি দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তথাপি তাঁর অসুরজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ত্রিশিরা, যিনি সোম এবং সুরা উভয়েরই প্রিয় ছিলেন। তিনি দেবতাদের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছিলেন গুপ্তচর হিসাবে। ইন্দ্র তাঁর উদ্দেশ্য জানতে পেয়ে তাঁকে বধ করেন। স্পষ্টই বোঝা যায় ত্রিশিরার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেবতাদের সোমবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অসুরদের গোচর করা। এ সম্বন্ধেও একটি বিশেষ কাহিনী আছে।

ইন্দ্র সোমের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। সুমিষ্ট এবং সুপেয় সোমরসের চেয়ে প্রিয় সেব্য তাঁর আর কিছু ছিল না। সোমের বহু প্রকারভেদ ছিল। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, সোমের বিভিন্ন রঙের জন্য ইন্দ্রের দাড়িও সময় সময় নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে যেত। ইন্দ্র বহু সোমপান করলেও নিয়ম মেনে চলতেন। আচার-বহির্ভূতভাবে সোমপান করা নিষিদ্ধ ছিল এবং তিনি সেই শৃঙ্খলা কদাচিৎ ভঙ্গ করতেন। যদি কোনও কারণে অনিয়ম হত তাহলে তাঁকে তার জন্য যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তারও কাহিনী দু-একটা আছে।

বৃত্র কিন্তু নরলোকে অর্চনা পেয়ে এসেছেন। কি কারণে জানি না বৃত্র এবং তাঁর সহচরদের হবিঃ প্রদান করা হত। বৃত্র ছাড়া আরও কয়েকজন বলশালী অসুরকে ইন্দ্র বিনাশ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শম্বর। ইন্দ্রের বন্ধু রাজা দিবোদাস (অতিথিগ্ব) একটি যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞে বাধা প্রদান করবার জন্য তাঁর পুরী আক্রমণ করলেন অসুর শম্বর। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন

রাজা যযাতির দুই পুত্র যদু এবং তুর্বশ। এই দুজনকেই ইন্দ্র বহু দূর থেকে তাঁর কাছে স্বর্গরাজ্যে ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু এঁরা কৃতজ্ঞ ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে এই দুজনকেও বধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। এঁদের প্রতি ইন্দ্রের দুর্বলতার কারণ এঁরা রাজা নহুষের বংশধর, যিনি তাঁর পূর্বে স্বর্গরাজ্যের প্রতাপশালী অধিপতি ছিলেন, যদিচ তিনি দেবতাবর্গীয় ছিলেন না। কুৎস ছিলেন এইরকম আর এক ব্যক্তি যিনি ইন্দ্রের যথেষ্ট অনুগ্রহ পেলেও মাঝে মাঝে তাঁর ক্ষতিসাধনে তৎপর হতেন।

যাই হোক্ শম্বরকে বিনাশ করা ইন্দ্রের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নি। পরাজিত শম্বর লুকিয়ে পড়লেন তাঁর গোপন দুর্ভেদ্য দুর্গে। এগার বৎসর অনুসন্ধানের পর ইন্দ্র তাঁর গোপন আবাসের সন্ধান পান এবং সেই দুর্গ ভেদ করে তাঁকে হত্যা করেন। সেইখানে তিনি অহি নামক এক সর্পপালককেও হত্যা করেন। এই সর্পপালকগণ আক্রমণকারীর ওপর বিষধর সর্প ছেড়ে দিয়ে তাদের বিনষ্ট করত বা ভয় দেখাত। এইরকম আরও একটি সর্পপালককে তিনি বধ করেছিলেন সমুদ্রে। তার নাম ছিল অর্বুদ। অহি নামক একজাতীয় দুর্ধর্ষ অসুরসম্প্রদায়ও ছিল যারা বৃত্রের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিল। এরা বৃত্রের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদের এক জলবেষ্টিত পুরীতে রক্ষা করেছিল, কিন্তু ইন্দ্র তাদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে সেই অবরুদ্ধ জলরাশি বের করে দিয়েছিলেন।

ভীষণ শক্তিসম্পন্ন অসুর নমুচিকে ইন্দ্র সমুদ্রের অল্প জলে যুদ্ধ করে নিহত করেন। এই অসুর হননে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়। শতপথ-ব্রাহ্মণের একটি কাহিনীতে প্রকাশ যে ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে বিনাশ করলে ত্বষ্টা ইন্দ্রকে উত্তেজিত করে বিষাক্ত সোমপান করান। এর ফলে ইন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় তিনি অসুর নমুচির বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত ছিলেন। নমুচি ইন্দ্রের সেই দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর সোমে গুপ্তচর দিয়ে উগ্র সুরা মিশিয়ে দিতে থাকেন। এতে ইন্দ্র আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইন্দ্রের অনুরোধে তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সরস্বতী তাঁকে চিকিৎসা ও সহায়তা দ্বারা নিরোগ করে তুললেন। অতঃপর ইন্দ্র বল ফিরে পেয়ে সমুদ্রের ফেনিল জলে অসুর নমুচিকে বধ করেন।

এক সময় কৃষ্ণ নামে এক অসুর এবং তাঁর পুত্রেরা অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে

উঠেছিলেন। তাঁদের বধ করতে ইন্দ্রকে সহায়তা করেছিলেন ঋজিশ্ব নামক একজন দৈবহিতৈষী।

ধুনি এবং চুনরী নামক দুই দৈত্যকে বিনাশ করবার জন্য ইন্দ্র একটি বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁর বন্ধু গৃৎসমদ ছিলেন তাঁরই মত দেখতে। তাঁকে তিনি একদা ঠিক নিজের মত সজ্জিত করে এই দুই দৈত্যের কাছাকাছি পাঠালেন। যখন ইন্দ্র ভেবে এই দুই দৈত্য তাঁকে আক্রমণ করলেন তখন ইন্দ্র অতর্কিতে তাঁদের বধ করলেন।

অসামান্য শৌর্যশালী ছিলেন এক অসুর, যাঁর নাম ছিল বল। এঁর একটি দুর্ভেদ্য পাষাণগুহা ছিল। সেই গুহায় শ্রেষ্ঠ গো-সম্পদ হরণ করে জমা করা হত। তাদের দুগ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্যাদি অসুরদের ভোগে লাগত। খাস ইন্দ্রের গোশালা থেকে অপহৃত হয়েছিল অনেক গাভী। এছাড়া এই অসুরের অপর উৎপীড়নও কম ছিল না। অথচ তাকে ধরা যেত না। ইন্দ্রের গুপ্তচরগণ অনেকদিন ধরে এই অসুরের খোঁজে ছিলেন। ক্রমে বেরিয়ে পড়ল তাঁদের আস্তানা। ইন্দ্র দেবসৈন্য নিয়ে ভেদ করলেন সেই গুহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর মন্ত্রদাতা বীর্যবান বৃহস্পতি। এই গুহাবিদারণও ইন্দ্রের এক বিরাট কীর্তি যার ফলে অসুর বলকে হিমাচল থেকে অনেক নিচে প্রস্থান করতে হল। যেসব গাভীকে উদ্ধার করা হল তার অনেকগুলিকেই ইন্দ্র ঋষি অঙ্গিরাকে উপহার দিলেন।

অসুর এবং দৈত্যদের সঙ্গে ইন্দ্রকে দমন করতে হয়েছিল বহু দুর্ধর্ষ দস্যুকেও। বঙ্গৃদ নামক এক জনপদের বহু স্থান থেকে তিনি ওই নামের দস্যুদের উৎখাত করেন। রাজা সুশ্রবস্ এবং তূর্বযান এই সব নিকৃষ্ট শত্রুদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছিলেন, ইন্দ্র তাঁদের উদ্ধার সাধন করেন।

পণি নামক দস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযানই দস্যুদমনে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অভিযান। এরা ছিল অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত অতি কৌশলী দস্যু। রসা নদীর অপর পারে ছিল তাদের লুকানো ঘাঁটি। এইখানে তারা বিস্তর ধনরত্ন, গাভী, অশ্ব প্রভৃতি হরণ করে জমা করেছিল। ইন্দ্রের নিজস্ব গো-সম্পদ এই অপহৃত গাভীদের মধ্যে কম ছিল না। এই দস্যুপুরীর সন্ধান ইন্দ্র বের করে ফেললেন বৃহস্পতি-নিয়োজিত গুপ্তচরদের সহায়তায়। নদী পেরিয়ে অভিযান চালানো তখনকার দিনে খুব কঠিন কাজ ছিল। অতএব, তিনি দস্যুদের অবস্থানটা ভাল করে জানবার জন্য

দূত পাঠালেন তাঁর কুক্কুররক্ষিণী সরমাকে। দেবরাজ বহু ভয়ঙ্কর এবং সুশিক্ষিত কুকুর পালন করতেন। এরা সন্ধানী গুপ্তচরের কাজ করত, আবার মৃগয়াতেও নিযুক্ত হত। যুধিষ্ঠিরই যে প্রথম কুকুর নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন এমন নয়, তাঁর অনেক আগে থেকেই স্বর্গে ভাল ভাল জাতের কুকুর রীতিমত যত্নের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছিল। ইন্দ্রের যেমন নিজস্ব পশুশালা, অশ্বশালা ছিল, তেমনি ছিল একটি শ্বনশালা যার পরিচর্চা ও তত্ত্বাবধানের ভার ছিল সরমার হাতে। এছাড়াও কোনও কোনও দেবজাতীয় ব্যক্তি কুকুর পালন করতেন, তাঁদের বলা হত শ্বনিন্।

দস্যুদের আস্তানায় পৌঁছে সরমা তাদের অনেক করে বোঝালেন অপহৃত সামগ্রী ফিরিয়ে দেবার জন্য এবং দেবরাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জন্য, যাতে তাদের ভাল হয়; কিন্তু তারা সে উপদেশে কর্ণপাতও করল না। তবে, তারা সরমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল এবং তাকে পানাহারে পরিতৃপ্ত করে বশ করে ফেলল। পরিতৃপ্তা কুক্কুররক্ষিণী ফিরে এসে ইন্দ্রকে কোনও খবরই দিতে চাইলেন না। প্রশ্ন করেও তিনি তাঁর কাছ থেকে কোনও সদুত্তর পেলেন না। চতুর ইন্দ্র ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন সহজেই। বিষম ক্রোধে তিনি পাদপ্রহার করলেন সেই কুক্কুর পালিকা সরমাকে। ভীতা সন্ত্রস্তা সরমা দেখলেন নারী বলে অব্যাহতি পাবেন না তিনি। তখন সবই খুলে বলতে বাধ্য হলেন তিনি; আবার পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন দলবল সহ ইন্দ্রকে পণিদের পাষাণ দুর্গে। সেখানে পণিদের সম্পূর্ণভাবে দমন করে ইন্দ্র ফিরে এলেন গো-সম্পদ মুক্ত করে।

বহু যুদ্ধ ও বহু পরিশ্রমে তাঁর শরীর যখন ভেঙে পড়েছে তখন তাঁরই অনুগৃহীত বৃষাকপি তাঁর ক্ষমতা অধিকার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁর বিরোধিতায় এবং নানা কারণেই এ চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। ইন্দ্র চিরকালই ইন্দ্র থেকে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনের পর পরিপূর্ণ রাজকীয় মর্যাদায় তাঁর শান্ত মৃত্যু ঘটেছিল—এইটাই ধারণা করা যায়। কিন্তু তার কোনও উল্লেখ বোধ করি সংহিতাভাগে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রের পুত্র কে ছিলেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। অনেকে বলেন বসুক্র নামে এক ঋষি তাঁর পুত্র ছিলেন; কিন্তু যেহেতু তিনি ঐন্দ্র বসুক্র বলে পরিচিত সেহেতুই তাঁকে ইন্দ্রের পুত্র বলা যায় না।

এই হচ্ছে সংক্ষেপে অতি দুর্ধর্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের অশান্ত বিপদসঙ্কুল জীবনের

কাহিনী। এই জীবনে কি কেবল যুদ্ধবিগ্রহ কুটিল রাজনৈতিক অভিযান ছাড়া আর কিছুই ছিল না? ছিল বৈকি। বহু মুহূর্ত এসেছে তাঁর জীবনে যখন তিনি রমণীর সান্নিধ্যে এসেছেন এবং প্রেমের রোমাঞ্চকর অনুভূতি লাভ করেছেন। সংহিতাভাগে সেসবকথা কমই আছে, কারণ এ গ্রন্থ প্রধানতঃ শৌর্যবীর্য এবং প্রার্থনার কাহিনী। ব্রাহ্মণভাগসমূহে এর সঙ্গে আরও কিছু তথ্য যুক্ত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা অধিক কাহিনী প্রচারিত হয়েছে পুরাণে, কিন্তু সেগুলি কাহিনীতেই পর্যবসিত।

ঋষি অত্রির কন্যা অপালার প্রতি ইন্দ্রের আসক্তি ছিল তাঁর চর্মরোগ সত্ত্বেও। অপালাকে ইন্দ্র পিতার আশ্রমে নিভৃতে দেখতে পেয়ে আকৃষ্ট হন। তিনিও ইন্দ্রের কামনার কথা জানতেন এবং পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি আসক্তা ছিলেন। একদিন ইন্দ্র গোপনে কাছাকাছি প্রতীক্ষা করছিলেন। অপালা ছল করে কলসি কাঁধে জল আনতে বেরুলেন। সরোবরে পুষ্ট সোমলতা দেখতে পেয়ে কয়েকটা ডাঁটা তিনি মুখে চিবিয়ে নিলেন; তারপর ইঙ্গিতে আহ্বান করলেন দেবরাজকে। ইন্দ্র তাঁর মুখ থেকে পরম পুলকে সেই চর্বিত সোমরস পান করলেন। শেষ পর্যন্ত অপালা ইন্দ্রের চেষ্টায় চর্মব্যাধি থেকেও আরোগ্যলাভ করেন। দেবপত্নীগণ যে সোমপান করতেন তারও উল্লেখ মন্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র আরও একটি রমণীর চর্মরোগ সংশোধন করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন অঙ্গিরস বংশীয়া অকূপার। তাঁর গায়ের চামড়া ছিল গোধার মত কর্কশ। সেই চর্ম না কি চিকিৎসা দ্বারা সূর্যের মত জ্যোতিসম্পন্ন হয়েছিল। এই আখ্যায়িকাটি আছে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে।

অহল্যার প্রতি ইন্দ্রের আসক্তি সর্বজনবিদিত। যদিচ অহল্যাকে পরবর্তী কালে বহু গৌরব প্রদান করা হয়েছে তথাপি ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ সোজাসুজি ইন্দ্রকে অহল্যার জার বলে প্রচার করেছেন। এই গ্রন্থে প্রদত্ত আখ্যায়িকা অনুসারে জানা যায় যে কুশিক গোত্রে উৎপন্ন কোনও এক ব্রাহ্মণ মিত্রার দুহিতা মৈত্রেয়ী অহল্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণকে লোকে গৌতম নামে অভিহিত করত। গৌতম এক সময়ে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তিনি বিশ্রামের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লেন এমন এক জায়গায় যেখানে দেবতারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য শিবির স্থাপন

করেছেন। তিনি দেবতাদের মধ্যে বসে বিশ্রাম করছেন এমন সময় ইন্দ্র এসে বললেন—"ভগবন্ আপনি এখানে আমাদের মত সজ্জিত হয়ে আমাদের চরবৃত্তি গ্রহণ করুন নইলে অসুরগণ আপনাকে জীবিত রাখবে না।" গৌতম এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন—"আমি এইভাবেই থাকতে চাই।" ইন্দ্র তখন তাঁকে বললেন—"আপনাকে বাঁচাতে হলে আমাকেই আপনার রূপ ধরে সতর্কভাবে ভ্রমণ করতে হয়।" সম্ভবত ঋষিকে গোপনে রাখা হয়েছিল এবং ইন্দ্র নিজে গৌতমের ছদ্মবেশে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছিলেন।

ওদিকে ইন্দ্রের মহিষী শচীরও যে অপর পুরুষের প্রতি দুর্বলতা ছিল না এমন নয়। জৈমিনী ব্রাহ্মণের একটি আখ্যায়িকায় ঔরব কুৎসের প্রতি শচীর দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্র কুৎসকে এক সময় তাঁর সারথি নিযুক্ত করেছিলেন। বোধ করি এর কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, কারণ কুৎস নাকি অনেকটা ইন্দ্রের মতই দেখতে ছিলেন। ইন্দ্র অনেক সময় তাঁর মত আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কাজে লাগাতেন, যেমন গৃৎসমদকে তিনি নিজের ছদ্মবেশে সজ্জিত করে দুই দৈত্যকে সংহার করেছিলেন। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ ধারণ করে কার্যসিদ্ধি করতেন। কিন্তু এইখানে একটি অকল্পিত ব্যাপার ঘটল।

একদিন তিনি তাঁর পত্নীকে সারথি কুৎসের সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শচীকে তিনি তিরস্কার করলেন। ইন্দ্রাণী যেন একেবারে অবাক হয়ে গেছেন এমন ভাবে বললেন—"সে কি? আমি তো জানতুম তুমিই আমার কাছে এসেছিলে। আমি তো কিছুই সন্দেহ করতে পারি নি।" রাগ করে ইন্দ্র কুৎসের মাথা কামিয়ে দিলেন, কিন্তু কুৎস ইন্দ্রের মত একটি শিরস্ত্রাণ দিয়ে মাথা আবৃত করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আবার একদিন শচী ধরা পড়লেন ওই লোকটির সঙ্গে। সেবারেও একই উত্তর। ইন্দ্র তখন সারথির দুই কাঁধে ছোট ছোট বালির বস্তা এঁটে দিলেন। এরকম একটি রীতি না কি সেকালে সারথিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কুৎস এমনভাবে পোশাক পরলেন যে সে দুটি বস্তা ঢাকা পড়ে গেল এবং আবার তিনি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হলেন। সেবারেও ধরা পড়ে যাবার পর ইন্দ্র কুৎসকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলেন; কিন্তু ভীত কুৎসকে প্রাণে না মেরে দেশান্তরে নির্বাসিত করলেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, ইন্দ্রাণীর

সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল বলেই কুৎসের পক্ষে তাঁর সঙ্গে বার বার মিলিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। তখনকার দিনে স্ত্রী-পুরুষের নৈতিক স্খলন খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই এটা সহ্য করে নেওয়া হত। যাই হোক, এগুলি সংহিতা-সমর্থিত নয়, অতএব এসব আখ্যায়িকার সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কোনও মত প্রকাশ করা যায় না।

ইন্দ্রই যে স্বর্গরাজ্যের প্রথম অধীশ্বর ছিলেন এমন নয়। তাঁর আগে বহুজনই স্বর্গ শাসন করেছেন, কিন্তু তাঁরা কেউই ইন্দ্র ছিলেন না। বৈদিক ইন্দ্র থেকে শুরু হয় ইন্দ্রত্ব পদ। রাজা নহুষকে সে হিসাবে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর বলা চলে। তিনি ইন্দ্রের কিছুটা পূর্ববর্তী। ইন্দ্র প্রায় যযাতির সমসাময়িক, কেন না তিনি তাঁর দুই বহিষ্কৃত পুত্র যদু ও তুর্বশকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্বর্গরাজ্যে দেবগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। বিরাট অসুর-সভ্যতা দেবগণের সমকক্ষই ছিল, কিন্তু প্রভুত্বপ্রিয়তা, দম্ভ অত্যাচারপরায়ণতা এবং অর্থলিপ্সার জন্য তাঁরা জনগণের একান্ত অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে দেবগণের সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁরা স্বর্গরাজ্য থেকে সমূলে বিতাড়িত হলেন। শেষ পর্যন্ত আসীরিয়ায় অসুররাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিলেন; কিন্তু ততদিনে তাঁরা সম্পূর্ণ অন্য জাতিতে পরিণত হয়েছেন।

দেবতাদের সাহায্যে ইন্দ্র স্বর্গকে একেবারে আলাদা রাজ্যে পরিণত করেছিলেন কিন্তু ততদিনে মর্ত্যভূমি এবং সমুদ্র পর্যন্ত সবই যথেষ্ট পরিচিত হয়ে গেছে। তিনি সপ্তসিন্ধুকে মুক্ত করেছিলেন। সেকালে হিমাচলের উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেতপর্বত এবং কালশৈল—এই পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে গঙ্গা সপ্তধা হয়ে গিয়েছিল। এই বিশাল উর্বরভূমি ইন্দ্র সম্পূর্ণ শত্রুশূন্য করে এমন দুর্ভেদ্য করে রেখেছিলেন যে কয়েকটি সুরক্ষিত গুপ্তপথ ভিন্ন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের আর কোনও উপায় ছিল না। এতদ্ভিন্ন তাঁকে পঞ্চক্ষিতির অধিপতিও বলা হয়েছে। এই পঞ্চক্ষিতি বলতে বোধ করি কুরুপাঞ্চাল দেশকেই বোঝানো হয়েছে। এই সব অঞ্চলকেও দেবতারা প্রয়োজনবোধে সাহায্য প্রদান করতেন।

শাসক হিসাবে ইন্দ্র সেযুগের প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একনায়ক ছিলেন। তথাপি তিনি নিয়ম, শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। দেবতাবর্গীয় স্বর্গরাজ্যে ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকেও তিনি মেনে নিয়েছিলেন। যদিও তিনি প্রচুর ধনরত্ন, অশ্ব এবং গোসম্পদের

অধিকারী ছিলেন তথাপি সেসবই তিনি প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করতেন। সকলের হিতের জন্য যেসব কাজে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছিলেন সেগুলির মধ্যে কৃষি, গোপালন প্রভৃতি তো ছিলই, এ ছাড়া জলনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ইন্দ্র কূপ বা মাটির গর্ত থেকে চক্রযন্ত্রের সাহায্যে জল নিষ্কাশন করতেন। এটি কৃষিকার্যের সহায়ক তো ছিলই তাছাড়া পার্বত্য জমিকেও এই জলসেচ উর্বর করে তুলত। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—"এই ইন্দ্রের চক্র জল ভেদ করে চলে গেছে। এই জন্যই এই সুমিষ্ট জল চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবীতে তৃষিতের জন্য এটি স্তনস্বরূপ।" বলা বাহুল্য এস্থলে পৃথিবী অর্থে স্বর্গলোকই বোঝাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই পৃথিবী শব্দটি খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—"যখন বলবত্তম ইন্দ্র বড় বড় প্রবাহরূপে অবস্থিত বর্ষার জল আনয়ন করেন তখন পুষা তাঁর সহায়তা করেন।" ইন্দ্র সম্বন্ধে মন্ত্রাদিতে যেসব বিশেষণ পাওয়া যায় প্রসঙ্গতঃ সেগুলিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। ইন্দ্র শতক্রতু নামে পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ, তিনি বিরাটভাবে মঙ্গলকর অনুষ্ঠান অন্ততঃ একশতটি করেছিলেন। 'সৎপতি'-ও ইন্দ্রের অপর একটি পরিচিতি। মন্ত্রে বন্দনা করা হয়েছে—গোসমূহের পতি, সত্যের পুত্র, সৎপতি ইন্দ্রকে স্তুতিসমূহদ্বারা অর্চনা কর। সদা বধনশীল বলে তিনি শচিষ্ঠ আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। চাষকর্মে অসাধারণ অভিজ্ঞ বলে তাঁকে 'বিচষণি' বলা হত। একটি মন্ত্রে আছে—"তোমাদের জন্য সকলের সংরক্ষণকর্তা শত্রুর ভীতি উৎপাদক অন্নের এবং গো সম্পদের সহিত যুক্ত সমান ইন্দ্রকে প্রশংসা করি।" এই 'সমান' আখ্যাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বোঝাচ্ছে যে ইন্দ্র নায়ক হলেও সকলের সহিত একতুল্যই ছিলেন। তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনাতেও এইটাই স্পষ্টরূপে সূচিত হয়েছে। একটি স্তোত্রে গান করা হয়েছে—"হে ইন্দ্র, যে ধন অধম তা তোমার হোক, মধ্যম ধনকেও তুমি বাড়িয়ে তোল, ঘরে বিশ্বের পরম ধনেরও তুমিই একচ্ছত্র অধিপতি। গো প্রভৃতি কোনও পশু-সম্পদ থেকে কেউ তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।" এই মন্ত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে ইন্দ্র অধম, মধ্যম, এবং উত্তম—সকল পর্যায়ের ব্যক্তিকেই রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং সকলেই তাঁকে গোধন উপহার দিতেন। ইন্দ্র অর্থের বিনিময়ে কদাচ বিশ্বাসঘাতকতা করতেন না। এ সম্পর্কে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করি। "হে বজ্রী, বহু

শুল্কের বিনিময়ে তোমাকে পরের কাছে অর্পণ করা যায় না। হে বজ্রধারী ইন্দ্র, সহস্র শুল্কের বিনিময়েও নয়। হে বহুধনসম্পন্ন ইন্দ্র শত বা অযুত ধনের বদলেও তোমাকে বিক্রয় করা যায় না।" পূর্বেই যে কথা বলেছি তার আর একটু পুনরুল্লেখ করি। একটি মন্ত্র বলছেন—"হে ইন্দ্র, তুমি, (পর্বতের বনভূমি বিদীর্ণ করে) উৎস খুঁজে বের করেছ। খনন করে (জলভূমি) প্রস্তুত করেছ। তুমি বিশাল বিশাল পর্বতে যে সব স্থান দানবগণকে বহন করত সেই সব স্থানকে ধারাসমূহে প্লাবিত করে দিয়েছ।" এই ধরনের মন্ত্র থেকে ইন্দ্র যে কত বড় আবিষ্কারক (explorer) এবং জলবিশারদ ছিলেন তা উপলব্ধি করা যায়। একটি মন্ত্রে জানা যায় বৃত্র প্রভৃতি অসুর প্রথমে দেবগণের শত্রু ছিলেন না, কিন্তু ইন্দ্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাই তাঁদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। এ সম্বন্ধে একটি মন্ত্র বলছেন—"হে ইন্দ্র, তোমার জন্মকাল থেকে সাতজন, যারা এ পর্যন্ত অশত্রু ছিল তারা (কৃষ্ণ, বৃত্র, নমুচি, শম্বর, বল, ধুনি, চুনরী) শত্রু হয়ে পড়ল। তারা দ্যাবাপৃথিবীর গূঢ় অংশগুলি আবিষ্কার করে সমস্ত ভুবনের ঐশ্বর্য আহরণ করে রণে প্রবৃত্ত হল।" দেবগণ ইন্দ্রকে শুদ্ধতার প্রতীক বলে মনে করতেন এবং তিনিই একক "জনানাং অতিথিভূঃ", অর্থাৎ একমাত্র জনসমাজের আতিথ্যগ্রহণ করেন (সকলের কাছে যেতে পারেন)। ইন্দ্রের অপর একটি আখ্যা 'লোককৃত্নু' বা লোকহিতৈষী। তাঁকে বিপ্র, বৃহৎ, ব্রহ্মকৃৎ, বিপশ্চিৎ—এই আখ্যাগুলিও প্রদান করা হয়েছে। মর্ত্যবাসিদের নিয়ে তিনি গো-সম্পদের অনুসন্ধানে একবারে সিন্ধু নদ পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন। এই পথ দিয়েই অসুরের কয়েকটি গোষ্ঠী ভারতের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান এবং তাঁদের অনুসরণও করেছিলেন দেবতাদের কয়েকটি দল যাঁরা আর ভারতভূমিতে ফিরে আসেন নি। এঁরাই বোধ করি সেকালের হর-মিতান্নী জাতিতে পর্যবসিত হয়েছিলেন, যাঁদের রাজধানীর নাম ছিল 'বসুকর্ণী' অঞ্চল,—সুদূর মেসোপোটেমিয়া।

দুন্দুভি

দুন্দুভি শব্দটিই যেন গাম্ভীর্য ও বীর্যের দ্যোতক। এটি একটি বাদ্যযন্ত্র, কিন্তু যে সঙ্গীতকে আমরা আর্টসঙ্গ বা পরিশীলিত সঙ্গীত বলি তার সঙ্গে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় নি কোনও সময়ে। আসলে দুন্দুভি জ্ঞাপকতার বাহকরূপে ব্যবহৃত হত। এটি ছিল মহান ঘোষণার সহায়ক যন্ত্র। রণবাদ্যে এর জুড়ি আর কিছু ছিল না। আবার, পবিত্রতম উৎসবাদিতেও এর প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনও যন্ত্রের উল্লেখ করা যায় না। সুপ্রাচীন যুগে একাধিক বীণার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের সুর এবং ঝঙ্কার নানা ক্রিয়াকর্মে, অনুষ্ঠানাদিতে মুখর হয়ে উঠত; কিন্তু দুন্দুভির মত শ্রদ্ধা ও সম্মান আর কোনও বাদ্য পেয়েছে বলে মনে হয় না। বেদসংহিতায় একাধিকবার দুন্দুভির স্তুতি প্রশস্তি করা হয়েছে। অথর্ববেদে দু'তিনটি সূক্তে দুন্দুভির স্তুতি পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি তো পুরোপুরি দুন্দুভিসূক্ত বলেই আখ্যায়িত হয়েছে। বীণা সম্বন্ধে এরকম বিশেষ কোনও সূক্ত বোধ করি নেই। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা চলে দুন্দুভি আমাদের প্রাচীনতম সর্বাপেক্ষা সম্মানিত রণবাদ্য ও ঘোষকযন্ত্র।

দুন্দুভি যন্ত্রটি হচ্ছে একালের নাকাড়া জাতীয় যন্ত্রের আকৃতিবিশিষ্ট। এটি দেখতে গামলার মত। এর মুখটিতে গোচর্মের আচ্ছাদন থাকত। কখনও কখনও এটি হরিণচর্মেও বেষ্টিত হত। এটি বাজানো হত একটি বা দুটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে। এই বাদ্যটি ছিল কাষ্ঠনির্মিত। এই কারণে এর আদি নাম ছিল বানস্পত্য দুন্দুভি। এর মুখের চামড়া যাতে নরম থাকে সেইজন্য—এতে ঘৃত মর্দন করা হত। দুন্দুভি দুই রকমের ছিল। একরকমের দুন্দুভি সর্বস্থলে বহন করে নিয়ে যাওয়া চলত। কিন্তু, অপর একপ্রকার দুন্দুভির আকৃতি হত বিরাট এবং এটি একটি জনপদে নানারূপ ঘোষণার জন্য ব্যবহার করা হত। সাধারণতঃ সুদীর্ঘ একটি বৃক্ষের কাণ্ডকে ফাঁপা করে এর উপরিভাগে চর্মের আচ্ছাদন যুক্ত করা হত। এটি মাটিতেই স্থাপিত থাকত। সঙ্কেতকালে বহু ব্যক্তি এর দু'দিকে দাঁড়িয়ে দণ্ড দিয়ে চর্মে আঘাত করতে থাকত। এতে ভীষণ জোর আওয়াজ হত যা দূর দূরান্তর থেকে শোনা যেত। আসামের পার্বত্য নাগাভূমিতে এইরকম দুন্দুভি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও দেখা যেত, হয়ত এখনও এগুলির ব্যবহার আছে।

এই বাদ্য সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ বৈদিক উল্লেখ যা পাওয়া যায় সেগুলি উদ্ধার করলে এই যন্ত্রটির মহত্ত্ব বা গুরুত্ব কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠমণ্ডলের সাতচল্লিশ সংখ্যক সূক্তে শেষ তিনটি মন্ত্রে বা অথর্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ডের একশ ছাব্বিশ সংখ্যক সূক্তে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এইরূপ।

হে দুন্দুভি, তুমি গর্জন কর এবং আমাদের বল প্রদান কর। তুমি পাপসমূহকে দূর কর এবং দুঃখপ্রদানকারী শত্রুদের বিনাশে সহায়তা কর। তুমিই ইন্দ্রের মুষ্টিস্বরূপ এবং তুমি দৃঢ়তর হও। তুমি শত্রুসমূহকে পরাজিত করে আমাদের জয়যুক্ত কর। কেতুযুক্ত (পতাকাবহনকারী) সৈন্যদের মধ্যে দুন্দুভি উচ্চস্বরে নাদ করতে থাকুক এবং আমাদের বীরগণ অশ্বের সঙ্গে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক। আমাদের রক্ষীগণ জয়যুক্ত হোক।

অথর্ববেদে এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা এইরকম।

"বৃক্ষের কাষ্ঠ থেকে নির্মিত বানস্পত্য দুন্দুভি গোচর্মদ্বারা বেষ্টিত। এই দুন্দুভি উচ্চঃঘোষ, সত্বপ্রদায়ী এবং সিংহের ন্যায় নাদ করে থাকে। তুমি বৃষের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন এবং তোমার শত্রুগণ দুর্বল। তুমিই ইন্দ্রের শত্রুদমনকারী শক্তি। তুমি যেন যূথের মধ্যে বৃষস্বরূপ। তুমি তোমার ভীষণ শব্দে শত্রুহৃদয়কে বিদ্ধ কর, তারা যেন গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করে। তুমি জয়যুক্ত হও, উচ্চস্বরে গর্জন করতে থাক, চতুর্দিকে যেন তোমার ধ্বনি প্রচারিত হয়। হে দুন্দুভি, তোমার দৈবী বাক্‌সমূহ ঘোষিত হোক। পুরোহিত যেমন ধনরত্ন সংগ্রহ করে আনেন, তেমনি তুমি শত্রুসমূহের ঐশ্বর্য আহরণ কর। দূর থেকে দুন্দুভিনির্ঘোষ শ্রবণ করে শত্রুজায়াগণ যেন ভীত ও সন্ত্রস্ত হয় এবং পুত্রদের হাত ধরে সেই সমরের হতাহতদের মধ্য থেকে পলায়নে প্রবৃত্ত হয়। ভূমির পৃষ্ঠে স্থাপিত হয়ে দুন্দুভি যে শব্দ করে তাতে অমিত্রসেনারা ছিন্নভিন্ন হয়। হে দুন্দুভি, তুমি দ্যুতিমান ও সত্যভাষণকারী। নভস্থলে ও অন্তরিক্ষে তোমার ঘোষণা সঞ্চারিত হোক, তোমার ধ্বনিসমূহ তড়িৎগতিতে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হোক, তুমি শত্রুর নিকটে গর্জন করতে থাক। তোমার শব্দ যেন শ্লোক রচনা করে চলেছে। তুমি আমাদের মিত্র, তোমার তূর্যধ্বনির জন্য আমরা জয়যুক্ত হব। দুন্দুভি যা ঘোষণা করে তা বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আমাদের বীরগণের আয়ুধসমূহ সেই ঘোষণায় চঞ্চল হয়ে উঠুক। ইন্দ্রসহায় আমাদের বীরগণকে তুমি আহ্বান কর। তোমার মিত্রগণদ্বারা অমিত্রগণ

দূরীভূত হোক। তোমার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, বাক্য ঘোষণা করছে, ভীষণ অস্ত্রসজ্জার সঙ্গে তোমার সাবধানবাণী গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। তুমি যা শ্রেয় তাকেই জান এবং আমাদের পক্ষে সহায়ক হও। যেখানে দুই পক্ষ রণে প্রবৃত্ত সেখানে বহু বীরকে তুমি কীর্তিদ্বারা ভূষিত কর। তুমি শ্রেয়কে বহন করে থাক, তুমি ঐশ্বর্যসমূহ জয় কর, তুমি সহনশীল এবং সংগ্রামে বিজয় প্রদান কর। তুমি সর্বদা সংশয়ের সঙ্গে অবস্থান কর, তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ। সোমরস নিঃসরণের কার্যে প্রস্তরগুলি যেমন গ্রাবশিলার উপর নৃত্য করতে থাকে, হে দুন্দুভি, তুমিও সেইপ্রকার শত্রুসম্পদের উপর নৃত্য কর। শত্রুনিপীড়নকারী বিজয়ী, ঐশ্বর্য অন্বেষণকারী তুমি একাধারে সহনশীল এবং ধ্বংসকারী। তুমি অচ্যুতকেও বিচ্যুত করতে সমর্থ, তুমি আনন্দযুক্ত, যুদ্ধনেতা, পুরোগামী। তুমি ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত, তুমি ধাবিত হও, আমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী শত্রুদের ভগ্নহৃদয় কর (অ ৫।২০)।"

"হে দুন্দুভি, আমাদের যারা অমিত্র তাদের হৃদয়ে তুমি নৈরাশ্য সঞ্চার কর, তাদের মনের দৃঢ়তাকে দুর্বল করে দাও। আমরা শত্রুচিত্তে ভীতি, অন্তর্বিদ্বেষ ও ক্লান্তি উৎপাদন করছি। তুমি এই শত্রুদের অপসারিত কর। আমরা যখন শত্রুদের প্রতি যজ্ঞের পবিত্র ঘৃত নিক্ষেপ করব তখন তারা যেন মনে, হৃদয়ে এবং চক্ষুতে সর্বতোভাবে কম্পিত হতে হতে পলায়ন করে। হে চর্মদ্বারা উত্তমভাবে নিবদ্ধ বানস্পত্য দুন্দুভি, তুমি বিশ্বজনের পরিচিত। যজ্ঞীয় ঘৃত দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে তুমি শত্রুহৃদয়ে ত্রাস বিস্তার কর। মৃগসমূহ যেমন মনুষ্যভয়ে অরণ্যের চতুর্দিকে পলায়মান হয়, তেমনি তুমিও অমিত্রগণকে আক্রমণ কর, তাদের ত্রাসিত কর এবং তাদের মোহগ্রস্ত কর। বৃকগণের (নেকড়ে বাঘ) আক্রমণে যেমন ছাগসমূহ পলায়ন করে, হে দুন্দুভি তুমিও তেমনি শত্রুগণকে আক্রমণ কর, ত্রাসিত এবং মোহগ্রস্ত কর। শ্যেনপক্ষীর ভয়ে যেমন পক্ষীগণ প্রতিদিন চতুর্দিকে উড্ডীন হয়, সিংহের গর্জনে যেমন অরণ্যচারিগণ ভীত, সন্ত্রস্ত হয়, তেমনি তুমিও শত্রুগণকে আক্রমণ কর, ত্রাসিত ও মোহগ্রস্ত কর। হরিণচর্মে আবৃত দুন্দুভি দ্বারা সমূহ দেবগণ সংগ্রামে তাঁদের অনুকূলে ভাগ্যনির্ধারণ করে থাকেন। যে ইন্দ্র তাঁর তীব্র পদক্ষেপ-সমূহের ছায়াপাত ঘটলে সকৌতুকে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হন, বহু সৈন্যসমভিব্যাহারে শত্রুগণ সেই লঘুপদী ইন্দ্রের সমীপবর্তী হলে ত্রাসযুক্ত হয়। দুন্দুভির সঙ্গে জ্যানির্ঘোষের শব্দ যখন দিকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় তখন শত্রুগণ

পরাজিত হয়ে সৈন্যসহ পলায়নে প্রবৃত্ত হয়। হে আদিত্য, তোমার তেজে শত্রুগণের চক্ষু ঝলসে যাক, তোমার মরীচিসমূহ তাদের সন্ধান বলে দিক। যাদের বাহুবীর্য বিগত হয়েছে, তারা নিচে মৃত্তিকাশায়ী হোক। হে পৃশ্নিপুত্র উগ্র মরুৎগণ, তোমরা ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করে শত্রুদের হনন কর। হে রাজন সোম, বরুণ, মহাদেব ইন্দ্র, মৃত্যু (যম), এবং সূর্যকেতুসহ (সূর্যলাঞ্ছিত পতাকা ধারণকারী) দেবসেনাগণ, তোমরা একচিত্ত হও এবং অমিত্র থেকে আমাদের জয় সম্পন্ন কর। তোমাদের জয় হোক (অ ৫।২১)।"

দুন্দুভির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এইসব মন্ত্র আমাদের সামনে দেবসৈন্যদের যুদ্ধযাত্রার একটি চিত্র স্থাপিত করে। আমরা দেখতে পাই পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি দেবসৈন্য সুসজ্জিত হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করছে। তাদের সঙ্গে বহু অশ্বারোহী এবং রক্ষাবাহিনী রয়েছে। সেনাদের একাংশ ইন্দ্রের প্রতীক সূর্যচিহ্নিত পতাকা ধারণ করে আছে। তাদের যাত্রার ভীষণ রূপটিকে দুন্দুভির গুরু গুরু ধ্বনি আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে এবং তারা দুঃসাহসিক অভিযানে উপযুক্ত উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চয় করছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতেও স্থানে স্থানে দুন্দুভির উল্লেখ আছে এবং এর এই গোল আকৃতিকে সূর্যের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। সামবেদীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে এসম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। এক সময় দেবতাগণের মধ্য থেকে বাক্ (সরস্বতী) অন্তর্হিত হয়ে জলে প্রবিষ্ট হলেন। দেবগণ তাঁকে আরাধনা করলে বাক্ বললেন—"মনুষ্যগণের মধ্যে (তথা দেবগণের মধ্যেও) পাপ প্রবেশ করেছে, জলই শুদ্ধ।" এই কারণেই বোধ করি বাক্ বা সরস্বতীকে জলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে থাকবে। আরও একসময় বাক্ হারিয়ে গিয়েছিলেন। দেবগণ তাঁর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে বাক্ বনস্পতিসমূহে প্রবিষ্ট হলেন। দেবগণ বনস্পতিকে এই শাপ দিলেন যে তোমাদেরই 'কিষ্কু' অর্থাৎ কাষ্ঠদণ্ডে প্রস্তুত বজ্রদ্বারা তোমাদের ছিন্ন করা হবে। দেবগণ তখন বাক্‌প্রবিষ্ট বনস্পতিকে দুন্দুভি, বীণা, অক্ষ (রথচক্রের মধ্যবর্তী তির্যক দণ্ড) এবং তূণ (যে আধারে ধনুঃশর রক্ষিত হয়), —এই চারটি ভাগে ভাগ করলেন। এই চারটিই হচ্ছে জীবনের আনন্দ, গতি, রক্ষা ও মৃত্যুর প্রতীক।

পুরাকালে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য কোন দলে থাকবেন তা নিয়ে অসুর এবং

দেবতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। আদিত্য স্বয়ং দেবতাদের ভজনা করেই এই বিরোধের মীমাংসা করেন। সূর্যের বৃত্তরূপকে আদর্শ করেই দেবতারা দুন্দুভির চর্মকে পরিমণ্ডল অর্থাৎ গোলাকারভাবে আবদ্ধ করেছিলেন। এই দুন্দুভি 'কোণ' বা দণ্ড দিয়ে বাজানো হত। এই দুন্দুভিসমূহের গম্ভীর শব্দ যেন বনস্পতিসমূহের মহান গাম্ভীর্যকেই ফুটিয়ে তুলত। এই শব্দেই বাক্ তাঁর সমস্ত মহিমা নিয়ে জাগ্রত হতেন। এই ধ্বনি প্রথম দেবগণের মধ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বনস্পতিসমূহের মধ্যে যে বাক্ প্রবিষ্ট রয়েছেন তাকে প্রাপ্ত হত। ভূমি দুন্দুভির শব্দে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত ধ্বনি জাগ্রত হত।

এতে এই ধারণা হয় যে অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের কালে স্বর্গরাজ্য বা হিমাচলের বিশাল পর্বতের নিস্তব্ধ অরণ্যে সূর্যবন্দনার সঙ্গে দুন্দুভির ঘোষণা করা হত। এই দুন্দুভির শব্দ অরণ্যের বিরাট মহীরুহসমূহে প্রকম্পিত হতে হতে দূর দূরান্তরে পরিব্যাপ্ত হত। এতে যেন মনে হত মৌন বনস্পতিদের অন্তরে যে বিরাট গাম্ভীর্য এবং মহিমা আছে তাই প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

বীণা প্রভৃতি সুকুমার বাদ্য সংহিতাভাগে কেবল উল্লিখিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু গৌরবে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে একটি চর্মবাদ্য যার উচ্চধ্বনি ছাড়া আর কোনও সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ছিল না।

দেবতা ও পৃথিবী

অথর্ববেদীয় ভূমি বা পৃথিবীসূক্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থন, কারণ এই বিস্তৃত কাব্যবন্ধ থেকেই এমন একটা যুগের পরিচয় পাওয়া যায় যে সময় দেবতারা পৃথিবীতে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছেন এবং মর্ত্যবাসীদের সঙ্গে একযোগে পৃথিবীর উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন। অমর্ত্যবাসী ও মর্ত্যবাসীদের সংযোগসূত্র সম্বন্ধে যদি কেউ কোনরকম হারানো সূত্রের পরিকল্পনা করেন তাহলে এই সূক্তটিই সেই হারানো সূত্রকে আমাদের কাছে উপস্থিত করবে এবং একটি বিরাট ঐতিহাসিক অভাবকে পূর্ণ করবে।

একটা সময় এসেছিল যখন স্বর্গলোক দেবগণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সেই সময় দেবতা, দেবজন এবং অসুর —সবাইকেই নতুন বসতির অনুসন্ধান করতে হয়; তাঁরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মর্ত্যপথে পৃথিবীতে নেমে আসতে থাকেন। এইখানে ক্রমে আরও বহু মিশ্রজাতির সৃষ্টি হল। মূল স্বর্গলোকের সঙ্গে তাঁদের অনেকের হয়ত সম্বন্ধ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তাঁরা মর্ত্যকে বহু অমর্ত্যবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই অভিযান বহুকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল এবং বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের সময় উভয় লোকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতম হয়ে ওঠে।

দেবতারা মর্ত্যকে সম্বোধন করে কয়েকটি মন্ত্রে বিশেষ করে তার মহিমা ঘোষণা করেছেন এবং তাঁরা যে সদাজাগ্রত থেকে পৃথিবীকে বিপদ থেকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন তারও উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃত করি। —

"হে দেবী যখন এখানে পুরাকালে দেবগণকর্তৃক তুমি প্রথমা বলে কথিতা হয়ে মহিমা অর্জন করছিলে তখন চতুর্দিক থেকে অকল্পনীয় মহত্ত্ব তোমাতে প্রবেশ করেছিল (অ ১২।৫৫)।"

"তোমার যে গন্ধ পদ্মে প্রবিষ্ট হয়, যা সূর্যার (সূর্যা-সাবিত্রী অশ্বিনীদ্বয়ের বিবাহিতা স্ত্রী) বিবাহে উদিত হয়েছিল, হে পৃথিবী, যে আদিম গন্ধ অমর্ত্যদের আমোদিত করে, সেই গন্ধে আমাকে সুরভিত কর। কেহ যেন আমাকে দ্বেষ না করে (অ ১২।২৪)"

"তোমার যে গন্ধ, পুরুষ এবং স্ত্রীপুরুষের ভাগ্য ও বাঞ্ছিত যুক্ত, যে গন্ধ

বীরগণ, পশুসমূহ এবং হস্তীগণের সঙ্গে সংপৃক্ত, যে দীপ্তি কন্যার মধ্যে নিহিত, হে ভূমি আমাদের জন্যও সেই গন্ধ সৃষ্ট কর। কেহ যেন আমাদের দ্বেষ না করে (অ ১২।২৫)।"

"সদা জাগ্রত দেবগণ যে তাবৎবস্তু প্রদানকারিণী পৃথিবী এবং ভূমিকে প্রমাদ থেকে মুক্ত করে রক্ষা করছেন, সেই পৃথিবী আমাদের চেষ্টায় মধু এবং প্রিয়সকল প্রদান করেন। তিনি আমাদের তেজদ্বারা পূর্ণ করুন (অ ১২।৭)।"

একটি মন্ত্র বলছেন—"যার ভিতর দেবতাদের নির্মিত গৃহ বর্তমান, যার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করা হয়, প্রজাপতি সেই বিশ্বগর্ভা পৃথিবীকে দিকে দিকে রমণীয় করে তুলুন (অ ১২।৪৩)।"

এতে প্রমাণ হচ্ছে যে দেবতাদের গৃহনির্মাণের আদর্শই মর্ত্যলোকে গ্রহণ করা হয়েছিল। দেবতাদের আসার বহু পূর্ব থেকেই কৃষিপদ্ধতিও যে বিশেষভাবে মর্ত্যভূমিতে প্রচলিত ছিল তারও প্রমাণ মন্ত্রাদিতে পাওয়া যায়।

"যেখানে সমুদ্র, সিন্ধু এবং বহু প্রকার বারি প্রবাহিত, যেখানে অন্ন বর্তমান, সেই পৃথিবীতে এই সবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে, চলছে, ফিরছে, যেখানে কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষ সম্যক্‌ভাবে বহুকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছেন, যেখানে পূর্বকাল থেকে যে যে বস্তু মানুষ ভোগ করে এসেছে—এই ভূমি সেই সমস্ত ভোগ ও ঐশ্বর্যই আমাদের প্রদান করুন (অ ১২।৩)।"

"যে পৃথিবী চতুর্দিকে প্রশস্ত, যেখানে অন্ন এবং কৃষিজীবিগণ সম্ভূত হয়েছে, যিনি আমাদের ধারণ এবং পোষণ করেন, যেখানে বহুভাবে প্রাণের সঞ্চরণ ঘটছে, সেই আমাদের ভূমির প্রসাদে গো এবং অন্ন সমৃদ্ধি লাভ করুক (অ ১২।৪)।"

পৃথিবীতে দেবতারা অধিষ্ঠিত হলে তাদের সঙ্গে দেবহিংসক 'দেবপীয়ু'গণ তাঁদের ক্ষতি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং অসুরগণও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই শত্রুতায় সহায়তা প্রদান করেছিলেন। শুধু এঁরাই নন, আরও শত্রুতাসম্পন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এছাড়া হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যও প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্ত্র—

"হে ভূমি, যে সমস্ত গন্ধর্ব, অপ্সরা, নির্ধন, কিমীদিন, পিশাচ, রাক্ষস রয়েছে, তাদের আমাদের কাছ থেকে দূরে প্রেরণ কর (অ ১২।৫০)।"

"হে পৃথিবী তোমার বনে যারা আশ্রিত—সিংহ, ব্যাঘ্র, হিংস্রপুরুষ, বৃকগণ,

সমূহ, মৃগ প্রভৃতি যারা তোমার উপর বিচরণ করে, বন্যবৃক, দুষ্ট কুকুর, ভল্লুক, রাক্ষস প্রভৃতিকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখ (অ ১২।৪৯)।"

"তোমাতে অবস্থিত সর্প, বৃশ্চিক, দংশনে তৃষ্ণা উৎপাদনকারী কীট, শীত ঋতুতে অনিষ্টকারী কীট, ঘূর্ণিজলে বর্ধিত কৃমি, বর্ষাকালে যে সব কীট গুহার ভিতর কম্পিত হয় এবং সর্পের মত অগ্রসর হয়—তারা যেন আমাদের কাছে আসতে না পারে। তোমার যা মঙ্গলজনক তাই যেন আমাদের সুখ প্রদান করে (অ ১২।৪৬)।"

"যা বিশেষ অন্বেষণের যোগ্য, যা কম্পিত সর্পিল গতিযুক্ত, জলসমূহের মধ্যে যে অগ্নি বর্তমান (সেই পৃথিবী) দেবহিংসক দস্যুসমূহকে বিদূরিত করুক। পৃথিবী ইন্দ্রকে বরণ করে, বৃত্রকে নয়। বলশালী শক্রের জন্যই শক্তিসমূহ সঞ্চিত আছে (অ ১২।৩৭)।"

"যেখানে প্রাচীনকালে অতীতের মানবগণ যুদ্ধাদিতে বিক্রম প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে দেবগণ অসুরগণকে পরাজিত করেছিলেন, সেখানে তাঁরা গো, অশ্ব এবং পক্ষিসমূহকে স্থায়িভাবে (গৃহপালিতরূপে) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই পৃথিবী আমাদের ঐশ্বর্য ও তেজ প্রদান করুন (অ ১২।৫)।"

পৃথিবীতে বসতি স্থাপনকারী বহু গন্ধর্ব এবং তাঁদের সহচরী অপ্সরাগণ দেবজন বলে পরিগণিত হলেও মর্ত্যে নিজেদের স্বার্থের জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেবতাদের হিংসা করতেন। এছাড়া ভবঘুরে গোছের বহু লোক ছিল যারা চৌর্যবৃত্তি বা দস্যুতা দ্বারা দেবতা ও মর্ত্যবাসীদের উৎপীড়িত করত। কিমীদিন, পিশাচ, ও রাক্ষসজাতীয়েরাও মর্ত্যভূমিতে নেমে এসেছিল অবস্থানের উপযুক্ত প্রচুর ভূমির সন্ধান পেয়ে। এরা সকলেই ছিল সমাজবিরোধী এবং এখানেও তারা একই বৃত্তি অবলম্বন করেছিল।

দেবতাগণ পৃথিবীতে অগ্নির ব্যবহারকে অনেক উন্নততর করে তুলেছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি মন্ত্র বলছেন—"দিব্যলোকে অগ্নি তাপ প্রদান করেন। দেবতাদের অগ্নিতে অন্তরীক্ষ ভারী হয়ে আছে। মর্ত্যবাসীগণ হব্যবাহ ঘৃতপ্রিয় অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে (অ ১২।২০)।" এই অন্তরীক্ষ (সংহিতা সর্বত্র 'অন্তরিক্ষ' বলেছেন) পথ ধরে দেবতা এবং পিতৃগণ দেবযান ও পিতৃযান অতিক্রম করে মর্ত্যলোকে নেমে আসতেন। ঐ সম্বন্ধে আরও মন্ত্র বর্তমান; যথা—"অগ্নিপ্রাপ্ত কৃষ্ণাকাশ হে পৃথিবী, তুমি আমাকে দীপ্তিমান করে তোল (অ ১২।২১)।"

অথবা, "ভূমি এবং ওষধিসমূহে অগ্নি বর্তমান। বারিসমূহেও অগ্নির প্রজ্বলন ঘটে। প্রস্তরসমূহে অগ্নি বর্তমান। পুরুষগণের ভিতর অগ্নির অস্তিত্ব রয়েছে। গোসমূহে এবং অশ্বসমূহে অগ্নি বিরাজমান (অ ১২।১৯)।" "যার মধ্যে দ্বিপাদ, হংস, সুপর্ণ, শকুন, বায়স প্রভৃতি পক্ষী আশ্রয় গ্রহণ করে, যেখানে আকাশচারী বাতাস ধূলি বিকীর্ণ করে বৃক্ষসমূহকে প্রকম্পিত করে প্রবাহিত হয়, প্রজ্বলিত অগ্নি সেই গতিকে অনুসরণ করে থাকে (অ ১২।৫১)।" অর্থাৎ অগ্নিকে পাবার যত সম্ভাব্য সূত্র আছে সবই দেবগণ অধস্তন মর্ত্যলোকে অন্বেষণ করে দেখেছিলেন। এর সঙ্গে তাঁরা খোঁজ করেছিলেন ওষধির; কারণ সুস্থ দেহে বেঁচে থাকবার জন্য ওষধির প্রয়োজন তাঁরা সবচেয়ে বেশি অনুভব করতেন। মন্ত্র বলছেন—"তাবৎ ওষধির মাতৃস্বরূপা এই ভূমি এবং পৃথিবী। ইনি ধর্মদ্বারা বিধৃতা। এই কল্যাণময়ী সুখদায়িনী পৃথিবীর সর্বত্র আমরা পরিক্রমা করব (অ ১২।১৭)।" এতে বোঝা যাচ্ছে যে ওষধির জন্য যতটা সম্ভব পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করা হত। এইসব ওষধি যেখানে পাওয়া যেত সেই স্থল বিশেষ গন্ধে সূচিত হত। "হে পৃথিবী, তোমার থেকে যে গন্ধ সম্ভূত হয়েছে, যে গন্ধ ওষধি ও জলসমূহকে বিশেষ গৌরব প্রদান করছে, যে গন্ধ গন্ধর্বগণ ও অপ্সরাগণ ভজনা করেন, আমাকে সেই সুরভিযুক্ত কর (অ ১২।২৩)।" যাতে এই সমস্ত ওষধি ও বনভূমি বর্ধিত হয়, সেজন্য তাঁরা সর্বদাই বারি কামনা করতেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাক।

"যেখানে বারিসমূহ বিনাবাধায় অহোরাত্র ক্ষরিত হচ্ছে, যেখানে বসতি স্থাপনকারিগণ সমানভাবে অবস্থান করেন, আমাদের সেই ভূমি প্রচুর ধারায় জল প্রদান করে থাকেন। অতঃপর তিনি আমাদের তেজদ্বারা বর্ধিত করুন (অ ১২।৯)।"

"আমাদের তনুতে শুদ্ধ বারিসমূহ ক্ষরিত হোক্, যা আমাদের অপ্রিয় তাকে পৃথক রাখা হোক্। হে পৃথিবী পবিত্র বস্তুদ্বারাই আমরা তোমাকে পবিত্র করব (অ ১২।৩০)।"

"যে ভূমিতে অন্ধকার এবং আলোক সংহিত হওয়ায় অহোরাত্র অতিবাহিত হয়, সেই পৃথিবী বর্ষণধন্য। কল্যাণময় সেই ভূমি আমাদের আবাসস্থল নির্ণয়ের জন্য প্রদান কর (অ ১২।৫২)।"

"যাঁর পরিধি অশ্বিনীদ্বয় পরিমাপ করেছিলেন, যেখানে বিষ্ণু বিক্রম প্রকাশ

করেছিলেন, ইন্দ্র স্বয়ং যাকে শক্ররহিত করেছিলেন সেই আমাদের মাতৃস্বরূপ এই ভূমি আমাদের পুত্রদের জন্য জল সৃজন করুন (অ ১২।১০)।"

শেষোক্ত মন্ত্রটি থেকে অনুমান হয় অশ্বিনীদ্বয় তৎকালীন মর্ত্যভাগের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছিলেন পৃথিবীতে লভ্যবস্তুগুলির অনুসন্ধানের জন্য। তিনি একটি Survey কার্য চালিয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। যেখানে যেখানে জলাভাব ছিল অথচ অপরাপর সুবিধা ছিল সেখানে সেখানে মর্ত্যসভ্যতা স্থাপিত হয়েছিল এবং কৃত্রিম-ভাবে বাপী, কূপ ও তড়াগ খনন করে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পৃথিবীতে সেখানকার আদিম অধিবাসিগণ এবং পর্যটনকারী দেবজাতীয়গণ উভয়েই বহু শক্রর সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইন্দ্র সকলের সহায়তায় এই শক্রদের উৎখাত করেন।

দেবতা ও দেবজাতীয়গণ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইন্দ্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্ত্র রয়েছে।

"সকলের পোষণকারী বসুসমূহের প্রতিষ্ঠাতা এই পৃথিবী হিরণ্যবক্ষা। চলমান সবকিছুই এখানে নিবেশিত হচ্ছে। এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করেছেন। ইন্দ্র এবং ঋষিগণ আমাদের ধন প্রদান করুন (অ ১২।৬)।"

"মহৎ অবস্থানে মহৎভাবে প্রতিষ্ঠিত তোমার সঞ্চালন ও কম্পন মহান বেগসম্পন্ন। তোমাকে মহান ইন্দ্র প্রমাদ থেকে বিমুক্তভাবে রক্ষা করেন। (সেই শক্তিসম্পন্ন হে ভূমি) তুমি হিরণ্যের ন্যায় ঝলকিত হয়ে প্রসারিত হও। কেহ যেন আমাদের প্রতি দ্বেষযুক্ত না হয় (অ ১২।১৮)।"

"আমাদের সেই ভূমিতে যে ধন আমরা কামনা করব তাই দিতে আদেশ কর। ঐশ্বর্য আমাদের অনুকূল হোক্। ইন্দ্র আমাদের পুরোধা হোন (অ ১২।৪০)।"

যেহেতু ইন্দ্র সকল সম্পদ বণ্টন করতেন সেহেতু ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ করে ইন্দ্রের প্রতি প্রার্থনা জানানো হত। স্বর্গলোক যেমন স্বর্ণসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল সেইরকম দেবগণ পৃথিবীতে এসে দেখলেন এই মর্ত্যলোকও হিরণ্যবক্ষা, এর ঐশ্বর্যেরও সীমা নেই। বহু মন্ত্রে এই পৃথিবীর সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রশংসা করা হয়েছে।

অবশেষে দেবগণ মর্ত্যলোকে স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগলেন এবং মর্ত্যবাসীদের সহায়তাপ্রদানেও প্রবৃত্ত হলেন অকুণ্ঠভাবে। কিন্তু, তাঁরা কদাচ

মর্ত্যবাসীদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে সচেষ্ট হন নি। পৃথিবীর লোকরাই বরাবর পৃথিবী শাসনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। একটি মন্ত্র বলছেন— "পৃথিবীতে যখন জনসমূহ তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তখন তাঁদের উপর অশ্ব যেমন ধূলি বর্ষণ করে সেইরূপ ধূলি বর্ষিত হয়েছিল। প্রসন্না, অগ্রসরমানা ভুবনের রক্ষাকর্ত্রী বনস্পতি এবং ওষধিসমূহকেও গ্রহণ করেছিলেন (অ ১২।৫৭)।"

এতে বোঝা যাচ্ছে যে মর্ত্যবাসীরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন এবং তাঁরা দেবগণের কাছ থেকে বনভূমির সংরক্ষণ ও ওষধিসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞানও অর্জন করেছিলেন। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে পৃথিবীতে যে শাসন আদিতে ছিল, তা রাজতন্ত্র নয়, জনসমূহের শাসন। এটি দেবতাদের অনুরূপ ধারায় প্রবর্তিত হয়েছিল। এইখানে যে শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তাকেও বলা হত 'রাষ্ট্র'। এ সম্বন্ধে একটি মন্ত্র বলছেন—

"যা পূর্বে সমুদ্রের সলিলে অধিনিহিত ছিল, যে পৃথিবীর হৃদয় সত্যদ্বারা আবৃত এবং যার পরম ব্যোমস্থল অমৃতস্বরূপ, সেই ভূমি আমাদের রাষ্ট্র, তেজ এবং বল প্রদান করুন (অ ১২।৮)।"

রাষ্ট্রস্থাপনের পর স্বর্গলোকের অনুসরণে পৃথিবীতেও রাষ্ট্রের সহায়ক সভা এবং সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"এই ভূমিকে অধিকার করে যে সকল গ্রামে (বসতি) স্থাপিত হয়েছে, যে যে স্থলে অরণ্য বর্তমান, যে সব ক্ষেত্রে সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যে সকল সভা ও সমিতি গঠিত হয়েছে.—সেই সবগুলিকেই আমরা চারু (অর্থাৎ সন্তোষজনক) বলে অভিমত প্রকাশ করি (অ ১২ ৫৬)।"

এই মন্ত্রটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে গ্রামগুলি রাষ্ট্রনিযুক্ত সভাসমিতিদ্বারা শাসিত হত; কিন্তু অরণ্যাঞ্চলেও উপযুক্ত দৃষ্টি রাখা হত এবং সেখানেও শাসনের প্রয়োজন ছিল, কেন না অরণ্য থেকে গ্রামের জন্য বহু নিত্যব্যবহার্য বস্তু সংগ্রহ করা হত। সমস্ত মিলিয়ে পৃথিবীতে দেবসভ্যতাই চালু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানবধর্মের মূলেও ছিল দেবতাদের মত অহিংসাবৃত্তি। এ সম্বন্ধে দুটি মন্ত্র উদ্ধৃত করি।—

"আমাদের চলাফেরায়, উপবিষ্ট অবস্থায় অবস্থানকালে বা দক্ষিণে বামে পদচালনায় আমরা যেন কাউকে ব্যথিত না করি (অ ১২।২৮)।"

"হে ভূমি, শয়ান অবস্থায় আমি যে দক্ষিণে বামে পার্শ্বপরিবর্তন করি, অথবা তোমার উপর পশ্চিমভাগে উপুড় হয়ে শয়ন করি, সকলেই সেইরূপ তোমার আশ্রয়লাভ করে। হে ভূমি, তুমি আমাদের হিংসা কোরো না (অ ১২।৩৪)।"

এই সঙ্গে মর্ত্যবাসী দেবগণ প্রার্থনা করলেন দীর্ঘ আয়ু যা তাঁরা স্বর্গলোকেও প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করতেন।

"হে পৃথিবী, তোমার প্রসূত নিরোগ ক্ষয়হীন বস্তুসকল আমাদের নিকট উপস্থিত হোক। আমাদের আয়ু দীর্ঘ হোক, আমরা প্রতিবোধিত হয়ে তোমার বলির (সেবার) জন্য একত্রিত হব (অ ১২।৬২)।"

দেবতারা পৃথিবীতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রচলিত হল। এ সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্ত্র ভূমিসূক্তে পাওয়া যায় তাতে কিভাবে এইসব আচরণ মর্ত্যলোকে স্থাপিত হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। মন্ত্রানুবাদ এইরূপ—

"বৃহৎ সত্য, ঋত (ন্যায়), উগ্রতা, তপস্যা, দীক্ষা, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। সেই পৃথিবী ভূতপূর্বদেব এবং ভবিষ্যৎ মানবদেব পত্নী (পালন কর্ত্রী)। এই পৃথিবী আমাকে তার অধিবাসী করুক (অ ১২।১)।"

"যাঁর ভূমিতে বেদীসমূহ রচিত হয়, যেখানে সমস্ত কর্মী যজ্ঞের বিস্তার সাধন করেন, যে পৃথিবীতে পুরাকাল থেকেই আহুতি সহযোগে উজ্জ্বল ঊর্ধ্বমুখী যূপকাষ্ঠগুলি অধুনা নিষ্ক্রিয়ভাবে বর্তমান, সেই আমাদের ভূমি বর্ধিত হচ্ছে এবং বর্ধিত হোক (অ ১২।১৩)।"

"অলঙ্কৃত ভূমিতে দেবগণের উদ্দেশে হব্য এবং যজ্ঞ প্রদান করা হয়। 'স্বধা' উচ্চারিত অন্নে মর্ত্যের মনুষ্যগণ জীবিত থাকে। এই ভূমি আমাদের প্রাণ এবং আয়ু প্রদান করুক। আমাদের পৃথিবীকে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করা হোক (অ ১২।১২)।"

"বিশেষভাবে অন্বেষণের যোগ্য পৃথিবীকে আমি আবেদন জানাই। ব্রাহ্মণের কার্যে ক্ষমাশীল এই ভূমি বর্ধিষ্ণু হোক্। বল, পুষ্টি, ঘৃত, অন্নভাগ ও ঔজ্জ্বল্যদ্বারা লক্ষিত হে ভূমি, তোমাতে আমরা আশ্রয় লাভ করি (অ ১২।২৯)।"

"যেখানে হবির্ধানে আসন পাতা হয়, যেখানে যূপ রক্ষিত হয়, যেখানে যজুর্বিদ্ ব্রাহ্মণগণ ঋক্ এবং সাম সহযোগে অর্চনা করেন, যেখানে ঋত্বিক্‌গণ ইন্দ্রের

পানের জন্য সোম যোজনা করেন, যেখানে ঋষিগণ পূর্বকাল থেকে প্রাক্তন রীতিতে আচরিত বাণীসমূহে স্তুতি করেন, যেখানে জ্ঞানিগণ তপস্যাসহকারে সপ্তসত্রে যজ্ঞ করেন, আমাদের সেই ভূমিতে যে ধন আমরা কামনা করব তাই দিতে আদেশ কর। ঐশ্বর্য আমাদের অনুকূল হোক্। ইন্দ্র আমাদের পুরোধা হোন (অ ১২।৩৮, ৩৯, ৪০)।"

"তুমি জনসমূহের অদিতি, স্তুতিযোগ্যা কামদুঘা পাত্রস্বরূপা। তোমার মধ্যে যেটুকুর অভাব আছে তা প্রথমজাত প্রজাপতি যজ্ঞদ্বারা পূরণ করে থাকেন (অ ১২।৬১)।"

প্রথমে যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটি থেকে অনুমান করা যায় যে দেবগণ অবতীর্ণ হবার পূর্বে একটি বিরাট মানব সভ্যতা নিম্নহিমাচলের ভারতভূমিতে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে যে এই পৃথিবী 'ভূতপূর্ব' মানবদের পালনকর্ত্রীস্বরূপ। দেবগণ যখন সেই মানব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন তাঁরাও প্রার্থনা জানালেন যে তাঁদের পরবর্তী দেবমানব উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় যে নব নব জাতিসমূহের অভ্যুদয় হবে, তাঁরাও যেন পৃথিবী কর্তৃক একইভাবে রক্ষিত হন। চতুর্থ মন্ত্র (অ ১২।২৯) থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবীর সর্বত্র সঞ্চরণ এবং পৃথিবীতে বিবিধ বস্তুর অবস্থিতি নির্ণয় করবার অভিপ্রায়ে দেবতাদের অনেকদিন লেগেছিল। 'যজ্ঞ' বিধিটি দেবতারাই প্রচলিত করেছিলেন, যখন তাঁরা পৃথিবীতে নেমে এলেন তখন এই ভূভাগের আচার আচরণে যথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটেছে। মানবসমাজ যখন যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তখন এটি একটি অর্চনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধৃত তৃতীয় মন্ত্র (অ ১২।.২) থেকে জানা যাচ্ছে যে মর্ত্যসম্প্রদায় ক্রমে যজ্ঞবিধির প্রবর্তন করেছেন এবং দেবগণের উদ্দেশে হব্যপ্রদান করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ও প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

পৃথিবী সম্বন্ধে অপর যে সব পরম রমণীয় মন্ত্র এই সূক্তে স্থান পেয়েছে সেগুলি যেন মর্ত্যধামে নবাগত দেবতাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকেই উৎসারিত হয়েছে। দেবতাগণ এই পৃথিবীর একটি বহুধা সুবিশাল মহীয়সী রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা তাঁদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই মন্ত্রগুলি হচ্ছে তাঁদের আন্তরিক অভিবন্দনা। এইগুলি পর-পর উদ্ধৃত করে এই নিবন্ধ শেষ করছি।

"শিলা, প্রস্তর, ধূলি—এরাই ভূমি। সেই ভূমি যেখানে [illegible]

সকলের সহযোগিতায় রক্ষিত। সেই হিরণ্যবক্ষা পৃথিবীকে আমি নমস্কার জানিয়েছি (অ ১২।২৬)।"

"যেখানে বনস্পতি বৃক্ষসমূহ সর্বদা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, সেই বিশ্বধারণের যোগ্যতায় ধৃত পৃথিবীকে পবিত্রভাবে প্রশংসা করি (অ ১২।২৭)।"

"হে ভূমি, তোমার পূর্বদিকে, উত্তরদিকে, অন্যান্যদিকে, তোমার নিচে এবং পশ্চাতে যে সকল প্রাণী বিচরণ করে তারা আমাদের মঙ্গলজনক হোক। এই ভুবনে যারা অবস্থান করছে তারা যেন অধঃপতিত না হয় (অ ১২।৩১)।"

"হে ভূমি, আমাদের পশ্চাৎ থেকে, সম্মুখ থেকে, উপর থেকে এবং নিচে থেকে বিনাশ কোরো না। তুমি কল্যাণকারী হও। আমার পরিপন্থী অর্থাৎ শত্রুগণের অগোচরে আমাদের শ্রেষ্ঠ বীরগণ যেন (অতর্কিতে) তাদের নিকটবর্তী হতে পারে (অ ১২।৩২)।"

"হে ভূমি, হে মেদিনী, সূর্যের সহায়তায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দৃষ্টি উত্তরোত্তর সমানভাবে রক্ষিত হোক। আমার চক্ষুর যেন কোনও অনিষ্ট না ঘটে (অ ১২।৩৩)।"

"হে ভূমি, তোমাকে খনন করলেও তুমি আবার ক্ষিপ্র বর্ধিত হও। আমি যেন অন্বেষণ করতে গিয়ে তোমার মর্মে আঘাত না করি। আমার হৃদয় তোমাতে সমর্পিত আছে (অ ১২।৩৫)।"

"হে ভূমি, তোমার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত,—তোমার ঋতু-সমূহ, তোমার বৎসর সমূহ নির্ধারিত হয়ে আছে। তারা অহোরাত্র আমাদের সুখ প্রদান করুক (অ ২।৩৮)।"

"যে ভূমিতে মর্ত্যবাসিগণ গীত ও নৃত্য করে, যেখানে হিংস্র অশ্বগণ চিৎকার করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যেখানে দুন্দুভি নিনাদিত হয়, সেই আমাদের ভূমি শত্রুদের দূরে প্রেরণ করুক। পৃথিবী, তুমি আমাদের শত্রুবিহীন কর (অ ১২।৪১)।"

"যেখানে ব্রীহি, যব প্রভৃতি অন্ন উৎপন্ন হয়, যেখানে পাঁচপ্রকার মনুষ্যজাতি বর্তমান (এঁরাই বোধ করি মর্ত্যের আদিম অধিবাসী, কেন না এঁদের মনুষ্যজাতি বলা হয়েছে), বর্ষণজলে অভিসিঞ্চিত সেই পর্জন্যপত্নী ভূমিকে নমস্কার করি (অ ১২।৪২)।"

"বিভিন্ন ধরনের গুহাসকল বসু, মণি, হিরণ্য এবং নিধিতে দীপ্তিমান হয়ে

আছে। পৃথিবী, তুমি সেসকল আমাদের দান কর। ধনদাত্রী, দানশীলা দেবী সুপ্রসন্না পৃথিবী আমাদের সম্পদসমূহ প্রদান করুন (অ ১২।৪৪)।"

"বহু প্রকার ধর্মাবলম্বী এবং বহুভাষী জনকে নিয়ে পৃথিবী এক গৃহের ন্যায় স্বীয়া দীপ্তিতে বিরাজিতা। অবিনাশিনী ধ্রুবা এই পৃথিবী দোহনকৃতা ধেনুর ন্যায় আমাদের ধনসমূহ প্রদান করুন (অ ১২।৪৫)।"

"তোমার যে বহু পন্থা জনসমূহের যাতায়াতের জন্য বর্তমান, যে সকল পথ রথের বর্ত্ম রূপে এবং শকটাভিযানের জন্য ব্যবহৃত হয়, যে সমস্ত পথে ভদ্রজন এবং পাপীজন উভয়েই যাতায়াত করে, সেই সমস্ত পথ যেন আমরা শত্রু ও তস্কর রহিত অবস্থায় পাই। যা শিব অর্থাৎ মঙ্গল তাই আমাদের সুখ প্রদান করুক (অ ১২।৪৭)।

"গুরুভার এবং দ্রব্যাদি বহনক্ষমা দীপ্তিময়ী পৃথিবী ভদ্র এবং পাপী—উভয়ের নিধনই সহ্য করেন। বরাহদ্বারা বিদীর্ণা এই পৃথিবী অপরাপর পশুর উৎপীড়নের জন্যও প্রস্তুত থাকেন (অ ১২।৪৮)।"

"শান্তিদায়িকা, সুরভিতা, সুখদাত্রী, অন্নদাত্রী, জলদাত্রী আমাদের এই পৃথিবী, এই ভূমি দুগ্ধদ্বারা আমাদের সম্ভাষণ করুন (অ ১২।৫৯)।"

"বিশ্বকর্মা ধূলিতে আকীর্ণা অন্তরিক্ষ পর্যন্ত প্রবিষ্টা যাকে (পৃথিবীকে) হবিদ্বারা আহ্বান করেছিলেন, সেই পৃথ্বীমাতার পুত্রদের জন্যই (সেই পৃথিবীর) গুহানিহিত ভোজনযোগ্য (ভোগ্য) বস্তুসমূহ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল (অ ১২।৬০)।"

"আমি সহিষ্ণুরূপে পরিচিত এবং উৎকৃষ্টতর ভূমিতে অবস্থিত। দিকে দিকে বিশেষ বিজয় লাভ করে আমি বিশ্বের পরাক্রমশালী শত্রুকে নাশ করতে সমর্থ হয়েছি (অ ১২।৫৪)।"

"যা উচ্চারণ করব তা মধুমৎ হবে, যা প্রেক্ষণ করব সেই বস্তু আমাদের সাহায্য করবে। আমরা যেন দীপ্তিমান হই এবং যারা আমাদের দোহন করতে আসবে তাদের আমরা যেন তীব্রবেগে বিনাশ করতে সমর্থ হই (অ ১২।৫৮)।"

"হে মাতা ভূমি, আমাদের কল্যাণের সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ। হে সম্যক জ্ঞানী কবি, তুমি আমাদের প্রাচুর্যের [illegible]